লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা
১৫ অক্টোবর, ২০০৫ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

স্বাগতম মাহে রমযান

এসেছে মাহে রমযান–পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস। এ মাসে মু'মিনের আধ্যাত্মিক কাননে ঘটবে নব-বসন্তের সমারোহ। স্বর্গীয় আনন্দে হিল্লোলিত হবে তার হৃদয় ভুবন। সাধক-মধুকরেরা ক্ষণে ক্ষণে আহরণ করতে থাকবে আধ্যাত্মিক পুষ্প-রস। সঞ্চিত করতে থাকবে সারা বছরের জন্য পাথেয়। এর আধ্যাত্মিক বারিধারায় সিক্ত করে নিবে দেহ-মন।

মাহে রমযান আসে স্বর্গীয় পাখা মেলে, অবারিত ইবাদত বন্দেগীর বাড়তি সুযোগ নিয়ে। মু'মিন বান্দা এটাকে কাজে লাগিয়ে নিরলস সাধনায় অন্বেষণ করে খোদার অনন্ত দিদার। আর রোযা-ই হচ্ছে এমন এক ইবাদত যার প্রতিদান বা পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা। এতো বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌তাআলা রোযা ছাড়া আর কোন ইবাদতের জন্য দেন নি।

রোযার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) বলেছেন–"প্রত্যেক জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট দরজা থাকে, ইবাদতের দরজা রোযা।" (জামেউস সগীর)

"রোযা ঢাল স্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিরাপদ দূর্গ।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

শুধু তাই নয়, তিনি (সঃ) অন্য এক জায়গায় বলেছেন–"যদি মানুষ রমযানের মর্যাদা, ফযিলত সম্পর্কে জানত তাহলে আমার উম্মতের সবাই আকাঙ্খা করত সারা বছরটাই যেন রমযান হয়ে থাকে।"

এ কারণে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে রমযানের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বুঝে রমযান থেকে ফায়দা উঠানো উচিত। আঁ-হযরত (সঃ) রমযানের পুরো মাস রোযা রাখার সাথেসাথে নফল ইবাদত অনেক বেশি করতেন। অন্য সময়ের তুলনায় তখন সদকা খয়রাত বেশি করতেন। এ মাসে তিনি কুরআন শিক্ষা, শিখানো ও শুনার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমাদেরও উচিত হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর সুন্নতকে পুনঃজীবিত করা।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) রোযা সম্পর্কে বলেছেন–"রমযান বড়ই কল্যাণমন্ডিত মাস, দোয়ার মাস।" আর এ মহান বরকতমন্ডিত মাস আগত প্রায়। তাই আমরা যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত ও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে মান্যকারী তাদের উচিত রমযানের কল্যাণরাজি দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করা; যেন এ রমযানে কুরআন তেলাওয়াত ও দরসের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠে আমাদের চারপাশ; তারাবীহ, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামায আর দোয়ার শব্দে জেগে উঠে আমাদের নিঝুম রাতগুলো হৃদয়ে জেগে উঠে কুরবানীর স্পৃহা, দীন-দুঃখীদের অভাব ঘুচাতে দ্রুত প্রসারিত হয় আমাদের হাত। সারা বছরের দুর্বলতাকে ধোয়ে মুছে এ রমযানে আধ্যাত্মিকতার আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয় আমাদের দেহ-মন। এ প্রত্যাশায় খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) এর সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও দোয়া করি–"হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ রমযানের সীমাহীন কল্যাণ প্রদান কর। প্রত্যেক অনিষ্ট, মন্দ থেকে বাঁচাও। তোমার রহমত ও ফযলের চাদরে চিরদিনের জন্য আবৃত করে রাখ।" আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের যুগ খলীফার এ দোয়াকে কবুল করুন। আর আমাদেরকে রমযানের সুফল লাভের তৌফীক দান করুন। (আমীন)

১৫ অক্টোবর, ২০০৫ইং

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৩
- হাদীস শরীফ ৪
- অমৃতবাণী ৫
- জুমুআর খুতবা ঃ
  পবিত্র রমযানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কল্যাণরাশি ৬-১২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- জুমুআর খুতবা ঃ তাকওয়ার উপর যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে সে মসজিদকেই এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদের মসজিদ বলা যায় ১৩-১৭
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ- *মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী*
- জুমুআর খুতবা ঃ নিজের ইবাদতকে জীবন্ত করুন। বাজামাত নামাযের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া দরকার। যদি এটা হয়ে যায়, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা খুব দ্রুত উন্নতি করব। ১৮-২৪
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ- মাওলানা *মোহাম্মদ আব্দুল মতিন*
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র ২৫-২৭
  সংকলন- *ইয়াকুব আলী ইরফানী*
  অনুবাদ- *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*
- ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ? ২৮-৩০
  হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)
  অনুবাদ- *শাহ মুস্তাফিজুর রহমান*
- কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত ৩১-৩৩
  অনুবাদ- নাজির আহমদ ভুঁইয়া
- মৃত্যুঞ্জয়ী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী ৩৪-৩৫
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- ভেড়ার হযরত কাযী সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ সাহেব ৩৬-৩৮
  অনুবাদ- *কওসার আলি মোল্লা*
- দোয়ার বরকত ৩৯-৪১
  মাকসুদা রহমান
- মেদভুঁড়ি ও হার্ট অ্যাটাক ৪২-৪৩
  ডাঃ পারভীন হাকীম আনোয়ার
- জিকরে খায়ের ৪৪-৪৫
  এ.কে রেজাউল করীম
- কুরআন হাদীসের আলোকে রোযা ৪৫
- তাহ্‌রীকে জাদীদের গুরুত্ব ৪৬
  অনুবাদ- *শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন*
- খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আসল চেহারা ৪৭-৪৮
- সার্কুলার ৪৯
- সংবাদ ঃ ৫০

প্রচ্ছদ ঃ জার্মান জামাতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদ্বোধন করছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

ছবি ঃ হাফিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা আত তাওবা

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। হায়! তারা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দানে সন্তুষ্ট থাকতো আর বলতো, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট (এবং) আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর রসূলও আমাদেরকে (অনেক কিছু) দান করবেন। নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগী।'

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৬০। সদকা[১১৯৩] কেবল অভাবী, অসহায়, এ কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রাপ্য আর (তাদেরও জন্য) যাদের হৃদয়ে ধর্মীয় অনুরাগ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য আর দাস মুক্তি, আল্লাহ্র পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহ এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۭ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬১। আর তাদের একদল আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে যে সবার কথায় কান দেয়।'[১১৯৪] তুমি বল, সে কান দেয় বটে তবে তা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য, সে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে এক মূর্তিমান কৃপা। আর যারা আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহ্র কসম খায়, অথচ তারা মু'মিন হয়ে থাকলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকেই তাদের বেশি সন্তুষ্ট করা উচিত।'

১১৯৩। 'সাদাকাত'-এর অর্থ এখানে বাধ্যতামূলক সদকা অর্থাৎ যাকাত। এ আয়াত যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাত যে ব্যক্তির উপর প্রদেয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছে; যথা (ক) 'ফোকারা' একবচনে ফকীর (মূল শব্দ ফাকারা) যার অর্থ, এটা তার পিঠের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল (লেইন)। অর্থাৎ দারিদ্র অথবা রোগ-ব্যাধিতে যারা ভেঙ্গে পড়ে তারা, (খ) 'মাসাকীন' (এক বচনে মিস্কীন, মূল-শব্দ সাকানা) অর্থাৎ সে সকল লোক যারা কর্মক্ষম কিন্তু তাদের উপায়-উপকরণের অভাব, (গ) সে সব লোক যারা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত বা যাকাতের অন্য কোন কাজে জড়িত, (ঘ) অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিম যাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, (ঙ) গোলাম, কয়েদী এবং অনুরূপ অন্যান্য লোকজন যাদেরকে আযাদ বা মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তি-পণ দিতে হবে, (চ) যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রভৃতি, (ছ) যে কোন সৎ কাজের জন্য, এবং (জ) সফরে অর্থাভাবে যারা অসহায় অবস্থায় নিপতিত অথবা যারা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয় অথবা সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করে।

১১৯৪। 'উযুনুন' (শাব্দিক অর্থ কান)-এর মর্ম এমন ব্যক্তি যিনি শ্রবণ করেন এবং যা কিছুই তাকে বলা হয় তিনি তা বিশ্বাস করেন। নানা অবজ্ঞাপূর্ণ এবং ঘৃণাসূচক মন্তব্য যা রসূল করীম (সঃ)-এর অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সম্বন্ধে করেছিল, সেসবের মাঝে একটি ছিল সকল সংবাদ বিবরণী বা রিপোর্ট যা কিছু তাঁকে বলা হতো তিনি শুনতেন এবং তৎক্ষণাৎই সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, তিনি যেন যান্ত্রিক শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়েছিলেন।

হাদীস শরীফ

রোযা

হাদীস ঃ হযররত আবূ আয়্যুব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদের দিন বাদ দিয়ে) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও পূর্ণাঙ্গীন শর্তাবলী সহকারে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিবট সবচে' প্রিয়। কারণ নামায রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে যে, রোযা তোমাদের মাঝে তাকওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এই তাকওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুত রোযা এমন ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে উহা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন -মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

হযরত রসূল করীম (সঃ) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কথা উল্লেখ করে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের ৩০টি ও শাওয়ালের ৬টি মোট ৩৬টি রোযা যে রাখবে সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পেল। এক হাদীসে আছে, এক রোযার দশটি সওয়াব। এভাবে ৩৬ ১০ মোট ৩৬০ হয় অর্থাৎ ৩৬০ দিন রোযা। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাকওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে এ তাকওয়া নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয় আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন এই রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি,যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ নফসে মুতমাইন্না'তে পরিণত হয়। আল্লাহতাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফীক দিন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

রোযার মাহাত্ম্য

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্ম শুদ্ধির জন্যে আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্‌ফী তাকৃত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীক্রোধ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে রোযার অর্থ শুধু ইহাই নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সঃ) রমযান শরীফে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এই দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্যে পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একইভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখেএবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ , তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং কাশ্‌ফী তাক্ত বা দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় ইহাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদাতাআলার যিকির বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যেই রোযা রাখে এবং আচার অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না, তার উচিত, সে যেন সর্বদা হামদ (প্রশংসা কীর্তন), তাসবীহ্ (আল্লাহর পাবিত্রতা মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহর তৌহীদ ঘোষণা) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ১৭/১/১৯০৭)।

"তৃতীয় বিষয়, যা ইসলামের মূল ভিত্তি, তা হ'ল রোযা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। প্রকৃত কথা এই যে, যে দেশে মানুষ যায় না সে এর অবস্থা কী বর্ণনা করবে? রোযা কেবল ইহাই নয় যে, মানুষ এই দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকে। বরং এর একটি তাৎপর্য ও এর একটি প্রভাব আছে, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের প্রকৃতিতে ইহা আছে যে, সে যত কম খায় ততই তার আত্মা পবিত্র হয় এবং 'কাশ্‌ফী-শক্তি (দিব্য-দর্শনের শক্তি) বৃদ্ধি লাভ করে। এতে খোদাতাআলার ইচ্ছা ইহাই যে, একটি খাদ্য কম কর এবং অন্যটিকে বাড়াও" (মলফূযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)।

"সর্বদা রোযাদারের এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদাতাআলার যিক্‌র-এ মগ্ন থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্ মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে, তাদের উচিত আল্লাহ্‌তাআলার 'হামদ' (প্রশংসা), 'তসবীহ' (গুণ কীর্তন করা) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে মগ্ন থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়" (মলফূযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)

পবিত্র রমযানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কল্যাণরাশি

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৫ই অক্টোবর, ২০০৪ তারিখ মসজিদ বায়তুল ফুতূহ, মরডেন, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে খুতবা দেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝١٨٤ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝١٨٥ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ۝١٨٦

(সূরা বাকারা ১৮৪-১৮৬ আয়াত)

এ আয়াতের তরজমা এই ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা সেভাবে ফরয করে দেয়া হয়েছে যেভাবে তোমাদের আগেকার লোকদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। গণনার মত্র কয়েকটি দিন। অতএব তোমাদের যে-ই রোগাক্রান্ত হয় অথবা সফরে থাকে তখন তার উচিত সে যেন ততটি রোযা অন্য দিনে পুরো করে। আর যেসব লোক এর সামর্থ্য রাখে না তাদের ওপর ফিদিয়া-একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো। অতএব যে-কেউ অতিরিক্ত পুণ্য করে তা তার জন্যে খুবই উত্তম। তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্টতর যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। রমযান সেই মাস যাতে কুরআন মানুষের জন্যে এক মহান হেদায়াত হিসেবে নাযেল করা হয়েছে আর এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী হিসেবে যাতে হেদায়াতের বিস্তারিত বর্ণনা এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করে দেয়ার বিষয় রয়েছে। অতএব তোমাদের যে-ই এ মাস দেখতে পায় সে যেন এর রোযা রাখে আর যে রোগাক্রান্ত হয় বা সফরে থাকে সে তো অন্য দিনগুলোতে গুণতি পুরো করে। আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্য চান আর তোমাদের জন্যে কাঠিন্য চান না এবং চান যেন তোমরা সহজে গণনা পুরো কর আর সেই হেদায়াতের ভিত্তিতে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সূরা বাকারা : ১৮৪-১৮৬)।

কাল থেকে ইনশাআল্লাহ্তাআলা রমযান আরম্ভ হতে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় আরম্ভ হয়েও গেছে। আমি শুনেছি, এখানেও কোন কোন লোক রোযা আরম্ভ করেছে। যা-ই হোক এ মাস যেখানে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্তাআলার আদেশ-নিষেধ মান্যকারীদের জন্যে অগুণতি কল্যাণ নিয়ে এসেছে সেখানে শয়তানের জন্যে বা শয়তানের গুণ-বিশিষ্ট লোকদের জন্যে কষ্টের মাসেও পরিণত হয়। কেননা, একটি হাদীসে এসেছে, শয়তানকে এ মাসে শৃঙ্খলিত করা হয়ে থাকে। কেননা, যখন মু'মিন এ মাসে অধিক থেকে অধিকতর তাকওয়ার ওপর চলার চেষ্টা করে এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে এ সবই তার কষ্টের কারণ হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করার অর্থ এই, আল্লাহ্র এক বান্দা যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে বৈধ বস্তুগুলো থেকেও নিজেকে নিজে বিরত রেখে থাকে তাহলে অবৈধ বস্তুগুলো থেকে, যেগুলোর ব্যাপারে শয়তান সময় সময় তার প্রাণে কু-প্ররোচনা দিতে থাকে সেক্ষেত্রে সেগুলো থেকে সুরক্ষার জন্যে কতটা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে? নচেৎ যে দৃঢ় ঈমানের অধিকারী নয়, যার প্রাণে রমযান মাসেও রোযার প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি হয় নি সে তো সুস্পষ্টভাবে রমযান মাসেও শয়তানের কব্জায় থাকে। সে তো রমযান মাসেও আল্লাহ্তাআলার ইবাদতের প্রতি অমনোযোগী থাকে। সে তো রমযানেও লোকদের অধিকার খর্ব করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং সুযোগ পেলে অধিকার খর্ব করে এবং দুখঃ-কষ্ট দেয়।

মোটকথা রমযান কল্যাণমন্ডিত মাস, তাদের জন্যে যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্তাআলার

ইবাদত করতে চায় এবং ইবাদত করে থাকে। এটা তাদের জন্যে কল্যাণমন্ডিত মাস যারা আল্লাহ্‌তাআলার সেসব আদেশ-নিষেধ মান্য করতে থেকে সব রকম পুণ্য কাজ করতে চেষ্টা করে এবং করে থাকে যেগুলো করতে আল্লাহ্‌তাআলা আদেশ করেছেন। আবার প্রত্যক সেই মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে থাকে যেগুলো পরিত্যাগ করতে আল্লাহ্‌তাআলা আদেশ দিয়েছেন। বরং কোন কোন বৈধ বস্তুকেও এ বিশেষ সময়ের জন্যে পরিত্যাগ করে থাকে যেগুলো পরিত্যাগ করার আদেশ আল্লাহ্‌তাআলা দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, এ রোযায় করণীয় ও কোন কোন বস্তু থেকেও বিরত থাকার কারণ এই, যেন তোমরা তাকওয়ায় উৎকর্ষ লাভ কর। তাকওয়া কী? তাকওয়া এই যে, পাপ থেকে রক্ষা পাও, পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা চালাও এবং এভাবে রক্ষা পাও যেভাবে কোন ঢালের পেছনে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পাওয়া যায়। আর মানুষ যখন কোন বস্তুর পেছনে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে তখন তার মাঝে একটি ভীতিরও সঞ্চার হয়। যে আক্রমণ থেকে সে রক্ষা পেতে চায় এর ভয়ের কারণে সে পেছনে আশ্রয় নেয়। তাই আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, রোযা রাখ আর রোযা রাখার পর যে করণীয় রয়েছে তা পালন করতে থেকে রোযা রাখ তাহলে তাকওয়ায় উৎকর্ষ লাভ করবে। নচেৎ, একটি বর্ণনায় এসেছে, তোমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখার মাঝে খোদার কোন উৎসাহ নেই। কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌তাআলা তো বলেন, তোমরা যে ভুল-ত্রুটি ও পাপ করেছো সেসব কুফল থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্যে একটি পথ বানিয়েছি যাতে তোমরা নিষ্ঠার সাথে দ্বিতীয় বার আমার কাছে আস। আর এসব রোযার মাঝে রমযানের রোযার কর্তব্য পালন করতে থেকে আমার সন্তুষ্টির খাতিরে বৈধ বিষয়াদি থেকে তোমরা বিরত থেকে থাক। তোমাদের এ চেষ্টা-সাধনার ফলশ্রুতিতে আমিও তোমাদের প্রতি কৃপার দৃষ্টি দিয়ে থাকি এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করি যেন তোমরা যে ভয়ের কারণে রোযা রেখে থাক এবং রোযা রেখে এ ঢালের পেছনে আশ্রয় নাও, তাকওয়া অবলম্বন করে থাক যে, তোমরা এতে সুরক্ষিত থাক এবং শয়তান তোমাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, এই যে তাকওয়া, এই যে ঢাল এ তো শয়তানের আক্রমণ থেকে আর পাপ থেকে রক্ষার যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এসব তোমাদের রোযা রাখার কারণে তোমাদেরকে সুরক্ষা দিচ্ছে। তাই এক সাধনা করে যখন তোমরা এর সুরক্ষার বেষ্টনীতে এসে যাও তখন এতে থাকারও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করারও আবশ্যকতা রয়েছে। এখন এ বেষ্টনীকে, এ-তাকওয়াকে আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করতে থেকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা আবশ্যক। আর যারা আগে থেকেই পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন তারা রোযার কারণে তাকওয়ার আরও উচ্চ স্তর লাভ করে যেতে থাকেন। আর উন্নতি করতে করতে আল্লাহ্‌তাআলার খুবই নৈকট্য লাভকারীতে পরিণত হতে থাকেন।

রোযা কেবল এক সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত খাওয়া ও পান পরিহার করার নাম নয়, যাতে তাকওয়ার উচ্চ স্তর লাভ হয়ে যাবে। যেভাবে আমি বলছি, রোযার সাথে সাথে অনেক রকম মন্দ কর্মও পরিহার করতে হবে আর আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতও আগের চেয়ে বেশি বেশি করে করতে হবে। তখনই তাকওয়া লাভ হবে এবং এতে উৎকর্ষও লাভ হবে।

এটা স্মরণ রাখা আবশ্যক, রোযা কেবল এক সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত খাওয়া ও পান পরিহার করার নাম নয়, যাতে তাকওয়ার উচ্চ স্তর লাভ হয়ে যাবে। যেভাবে আমি বলছি, রোযার সাথে সাথে অনেক রকম মন্দ কর্ম ও পরিহার করতে হবে আর আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতও আগের চেয়ে বেশি বেশি করে করতে হবে। তখনই তাকওয়া লাভ হবে এবং এতে উৎকর্ষও লাভ হবে।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও মানুষ অনবহিত। আসল বিষয় তো এই, যে দেশে মানুষ যায় না আর যে জ্ঞান জানা নেই তার অবস্থা কী বর্ণনা করবে? রোযা কেবল এতটুকুই নয় যে, মানুষ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকে বরং এর একটি মাহাত্ম্য আর এর প্রভাব রয়েছে। অভিজ্ঞতায় এটা জানা যায়, মানবীয় স্বভাবে এটা রয়েছে, যত কম খায় ততটাই আত্মশুদ্ধি হয় এবং দিব্য-দৃষ্টিশক্তি বাড়তে থাকে। এতে খোদাতাআলার ইচ্ছা এটা, একটি খাদ্য কম কর আর অন্য খাদ্য বাড়িয়ে দাও। রোযাদারকে সবসময় এটা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক, এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এই নয় যে, ক্ষুধার্ত থাকে বরং খোদাতাআলার স্মরণে তার মশগুল থাকা আবশ্যক যেন তাবাত্তল (আল্লাহর দিকে ঝোঁকা) ও ইনক্বেতা' (দুনিয়ার প্রতি অনীহা) লাভ হয়। অর্থাৎ খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক জুড়ে নেয়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর দুনিয়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবী যে ছেড়ে যেতে হবে সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।" অতএব রোযার এটাই উদ্দেশ্য, মানুষ এক রুটিকে পরিহার করে যা দেহকে পরিপুষ্ট করে, অন্য রুটি লাভ করে যা আত্মাকে প্রশস্ত করার ও তৃপ্তি দেয়ার কারণ হয়। যেসব লোক কেবল খোদার উদ্দেশ্যে রোযা রাখে আর নিরস আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে রোযা রাখে না তাদের আল্লাহ্‌তাআলার প্রশংসা, পবিত্রতা এবং গুণকীর্তন করতে থাকা উচিত।" অর্থাৎ প্রশংসাও করে, পবিত্রতাও ঘোষণা করে এবং আল্লাহ্‌তাআলার শ্রেষ্ঠত্বও বর্ণনা করে, আর তাঁকেই সব কিছু মনে করে "যাতে অন্য খাবারও তাদের লাভ হয়ে যায়" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড; পৃষ্ঠা ১০২, নব সংস্করণ)।

তাই [মসীহ মাওউদ (আঃ)] বলেছেন, রোযার কল্যাণ তোমাদের তখনই হবে যখন দৈহিক খাবার কম করে দিয়ে আধ্যাত্মিক খাবার বড়িয়ে দেবে। কেবল দুনিয়ার ব্যস্ততার পেছনে পড়ে থাকবে না। রোযা রেখে এ ছাড়া যে ভোরে সেহরী খেয়ে নিয়েছে আর পরে দুনিয়ার কাজে এবং ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে নচেৎ দুনিয়াদার ব্যক্তিরাও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ফ্যাশন হিসেবে খাবার কমিয়ে দিয়ে থাকে। তোমাদের খাবারের কমতি দেহের সৌন্দর্যের বা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে যেন না হয় বরং আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যেন হয়। আর এ সন্তুষ্টি তখনই লাভ হবে যখন আল্লাহতাআলার সাথে সম্পর্ক আগের চেয়ে বেশি হবে। তাঁর গুণ-গান করা ও তাঁকে সব শক্তি ও মাহাত্ম্যের মালিক মনে করে তাঁর প্রতি

অধিক ঝুঁকা তখনই রোযা শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে থাকবে এবং তাকওয়ায়ও প্রবৃদ্ধি ঘটবে। নচেৎ আমি যেভাবে বলেছি, অসংখ্য লোক এমন রয়েছে, মুসলমানদের মাঝে এমন সব লোক রয়েছে যাদের শয়তান প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা যায় না। এজন্যে যে, তারা তাকওয়া লাভ করতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় না আর তাদের কোন ডর-ভয়ও নেই।

আবার আল্লাহ্তাআলা বলেন, এ তাকওয়ার উন্নত স্তর লাভ করার জন্যে, পুণ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটানোর জন্যে আর শয়তান থেকে সুরক্ষার জন্যে এই যে ট্রেনিং কোর্স (অর্থাৎ রমযানের সাধনা-অনুবাদক) এটা দীর্ঘ সময়ের জন্যে নয় যে, তোমরা অস্থির হয়ে যাও, এতদিন কিভাবে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকবো! (আল্লাহ্) বলেন, বছরের কয়েকটি দিনই তো মাত্র। তোমরা শয়তানের কবল থেকে মুক্তি পেতে চাইলে এতটা কুরবানী তো তোমাদেরকে করতেই হবে। কেবল শয়তান থেকে নিরাপদ থাক বরং আল্লাহ্ বলেন, আমার সন্তুষ্টিও লাভ কর। তোমরা যদি চাও তাহলে আমার সন্তুষ্টি লাভ কর এবং আমার নৈকট্যপ্রাপ্ততে পরিণত হও। (আল্লাহ্) বলেন, যেসব লোক রোগাক্রান্ত অথবা সফরে রয়েছে, কেননা, রোগ-ব্যাধিও মানুষের সাথে লেগে রয়েছে, বাধ্য হয়ে সফরও করতে হয় তাই যেসব রোযা রাখা যায় না সেগুলোকে পরে পুরো কর। তাই এ সুযোগও আল্লাহ্তাআলা দিয়েছেন যেভাবে বলেছেন, কেননা, তোমরা আমার দিকে আসার, আমার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছো, এক সাধ্য-সাধনা করছো, তাই আমি তোমাদের কোন কোন স্বভাবজাত ও জরুরী বাধ্যবাধকতার কারণে তোমাদের এ সুযোগ দিয়ে দিয়েছি যেন চলতি বছরেই থেকে যাওয়া রোযা অন্য কোন সময়ে পুরো করে নাও। আল্লাহ্তাআলা বলেন, আমি তোমাদেরকে এ অবকাশ তোমাদের এ চেষ্টার মর্যাদা রক্ষার্থে দিচ্ছি যা তোমরা অবশিষ্ট দিনগুলোতে নিজেকে নিজে কষ্টে ফেলে আমার নৈকট্য লাভের জন্যে আমার খাতিরে করছো। (আল্লাহ্) বলেছেন, কেননা, তোমাদের এসব কাজ-কর্ম আমার খাতিরে হচ্ছে। তাই তোমরা সাময়িকভাবে রোগগ্রস্ত হলে বা কোন কোন সফর অথবা বাধ্যবাধকতার কারণে অনেক রোযা ছেড়ে দিয়ে থাক এবং আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছলও হলে সেক্ষেত্রে ফিদিয়াও দিয়ে দাও। এটা বাড়তি পুণ্য। আর পরে বছরের মধ্যে রোযাও পুরো করে নাও। আর যে চিররুগী অথবা এমন মহিলা যে দুধ পান করায় বা সন্তান-সম্ভবা, যেহেতু তারা রোযা রাখতে পারে না তাই এমনসব রুগীর ক্ষেত্রে নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ফিদিয়া দিতে হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কেবল ফিদিয়া তো শেখ ফানী (অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি-অনুবাদক) বা এ ধরনের লোকদের বেলায় হতে পারে যারা কখনও রোযা রাখতে পারে না। নচেৎ সাধারণ লোকদের মাঝে যারা স্বাস্থ্য লাভ করে রোযা রাখার যোগ্য হয়ে যায়-কেবল ফিদিয়ার ধারণা নব বিধানের দরজা খুলে দেয়" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড,পৃষ্ঠা ৩২২, নব সংস্করণ)। অর্থাৎ অনুমতির এমন এক পথ খুলে যাবে এবং প্রতেকেই নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা দেয়া আরম্ভ করবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে 'কেবল'শব্দ ব্যবহার করেছেন এর উদ্দেশ্য হলো, যারা পরে রোযা রাখার রাখবে। তারা যদি ফিদিয়া দিয়ে দেয় তাহলে এটা হবে অতিরিক্ত পুণ্য। পরে রোযাও পুরো করে নেয় এবং ফিদিয়াও দিয়ে দিচ্ছে। আর যারা রাখতেই পারে না এবং রাখার সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্যে ফিদিয়াই ধার্য। কেননা, এ প্রসঙ্গে যে, ফিদিয়া কিভাবে হবে এতে বিভিন্ন তফসীরকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, যারা সামর্থ্য রাখে তারা অবশ্যই ফিদিয়া দেবে এবং যারা সাময়িকভাবে রোগাক্রান্ত তারাও (ফিদিয়া দিবে)।

আবার তিনি (আঃ) বলেছেন, ওয়া **'আলাল্লাযীনা ইউত্বীকূনাহু ফিদইয়াতুন ত্বআমু মিসকীন**-এক ধরনের ফিদিয়ার কথা আমার মনে এসেছে যে, এ ফিদিয়া কাদের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে? তখন জানা গেল, (রোযা রাখার) সৌভাগ্য লাভের জন্যে না কি রোযা রাখার সৌভাগ্য এতে লাভ হবে। খোদাতাআলার সত্তাই সৌভাগ্য দিয়ে থাকেন। আর এ সব কিছু খোদাতাআলার কাছ থেকে যাচ্ঞা করা উচিত। খোদাতাআলা তো সর্বশক্তিমান। তিনি যদি চান এক যক্ষা রোগীকেও রোযা রাখার সৌভাগ্য দিতে পারেন। তাই ফিদিয়ার উদ্দেশ্য এই, যেন সেই সামর্থ্য লাভ হয়ে যায়। আর আমার দৃষ্টিতে এটাই উত্তম যে (মানুষ) দোয়া করে, হে আল্লাহ্! এটা তোমার কল্যাণমন্ডিত মাস। আমি এথেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। আর কি জানি আগামী বছর বেঁচে থাকি কি না থাকি অথবা থেকে যাওয়া রোযাগুলো রাখতে পারি কি না পারি এবং তাঁর কাছে সামর্থ্য যাচ্ঞা করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন আত্মাকে আল্লাহ্ অবশ্য (রোযা রাখার) সৌভাগ্য দিবেন (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৩, নব সংস্করণ)। [মসীহ্ মাওউদ (আঃ)] বলেছেন, যাদের রোযা রাখার ব্যাপারে সাময়িক বাধা সৃষ্টি হচ্ছে তারা যদি ফিদিয়া দিয়ে দেয় তাহলে আল্লাহ্তাআলা এর কল্যাণেই (রোযা রাখার) সৌভাগ্য দিতে পারেন ফিদিয়াও দিন আর দোয়াও করুন।

আবার তিনি (আঃ) বলেন, আসল বিষয় এই, কুরআন শরীফ প্রদত্ত অবকাশগুলোর ওপর আমল করাও তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। খোদাতাআলা মুসাফির ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে অন্য সময়ে (রোযা) রাখার অনুমতি দিয়েছেন আর অবকাশ দিয়েছেন। এ আদেশের প্রতিও তো আমল করা উচিত। আমি পড়েছি, অধিকাংশ বুযুর্গ এ অর্থ নিয়েছেন যে, কেউ যদি সফর বা রুগ্ন অবস্থায় রোযা রাখে তাহলে এটা পাপ। কেননা, উদ্দেশ্য তো আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভ নাকি নিজের ইচ্ছা। আর আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি আনুগত্যের মাঝে। তিনি যে আদেশ দেন তা পালন করা হয় এবং নিজ থেকে এর ওপর কোন ব্যাখ্যা না চাপিয়ে দেয়। তিনি তো আদেশই দিয়েছেন, **ফামান কানা মিনকুম মারীযান আও 'আলা সাফারিন ফাইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার** (সূরা বাকারা ঃ১৮৫) এতে আর কোন শর্ত লাগান হয় নি, "এমন সফর হবে বা এমন রোগাক্রান্ত হবে"। তিনি (আঃ) বলেছেন,"আমি সফরের অবস্থায়ও(রোযা রাখি না)। যেহেতু আজও আমার শরীর ভাল নেই তাই আমি রোযা রাখি নি" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮ নব সংস্করণ)।

আর তিনি (আঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি সফর ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে খোদাতাআলার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে। খোদাতাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, রুগ্ন ও মুসাফির রোযা রাখবে না। রুগ্ন ব্যক্তির

রোগ ভাল হলে আর সফর শেষ হলে পর রোযা রাখবে। খোদতাআলার এ আদেশের প্রতি আমল করা আবশ্যক। কেননা, মুক্তি অনুগ্রহের মাঝে, নাকি কেউ আমলের জোর দেখিয়ে মুক্তি লাভ করতে পারে? খোদাতাআলা এটা বলেন নি, রোগ বেশি হোক বা কম এবং সফর ছোট হোক বা দীর্ঘ বরং আদেশটি সাধারণ আর এর ওপর আমল করা উচিত। রুগ্ন ব্যক্তি ও মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফতওয়া অবশ্যই কার্যকর হবে" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠ ৩২১, নব সংস্করণ)।

কোন কোন লোক এমন আছে যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোরতা নিজের ওপর আরোপ করে থাকে অথবা আরোপ করার চেষ্টা করে আর বলে, আজকালকার সফর কোন সফরই নয়। তাই রোযা রাখা বৈধ। তিনি (আঃ) এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, জোর করে নিজেকে কষ্টে ফেলা পুণ্য নয় বরং আল্লাহ্তাআলার আদেশ-নিষেধ পালন করাই পুণ্য। নিজ পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা ঠিক নয়। যে আদেশ সুস্পষ্ট এর ওপর আমল করা উচিত। আর এটা খুবই সুস্পষ্ট আদেশ যে, রুগ্ন ও মুসাফির রোযা রাখবে না, তাই কল্যাণ এতে যেন, আদেশ পালন করা হয়, এটার মাঝে নয় যে, জোর করে খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।

একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রমযান মাসে সফরের অবস্থায় রোযা এবং নামাযের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, সফরের অবস্থায় রোযা রাখবে না। এর ওপর সেই ব্যক্তি বল্লেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি রোযা রাখার শক্তি রাখি। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাকে বল্লেন, **আন্তা আক্বওয়া আমিল্লাহ্** অর্থাৎ তুমি অধিক শক্তিশালী না আল্লাহ্? নিশ্চয় আল্লাহ্তাআলা আমার উম্মতের রুগী ও মুসাফিরদের জন্যে রমযান মাসে সফরের অবস্থায় রোযা না রাখাকে সদকা হিসেবে একটি অবকাশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে কেউ তোমাদের কাউকে কোন বস্তু সদকা দেয় আর সে সেই বস্তুকে সদকা দানকারীকে ফেরৎ দিয়ে দেয়?" (আল্ মুসান্নিফ লিল হাফিযুল কাবীর আবি আব্দুর রায্যাক বিন্ হুমুমুস্ সানআমী, ২য় খন্ড,পৃষ্ঠা ৬৫৬ বাবুস সিয়াম ফিস্ সফর)। তাই এটাতো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সদকা লাভ হচ্ছে।

আবার আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন, কুরআন একটি কামেল ও পরিপূর্ণ শরীয়ত গ্রন্থ, এ মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে।একটি হাদীসে এসেছে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রত্যেক বছর যতটা কুরআন অবতীর্ণ হয়ে থাকতো রমযান মাসে তা পুনরাবৃত্তি করিয়ে থাকতেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর আগে যে রমযান ছিল এতে দু'বার পুনরাবৃত্তি করানো হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, এতে একটি মহান হেদায়াত রয়েছে। তাই তোমরাও এ মাসে একে গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ কর। এমনিতে পাঠ তো করতেই হয় ; কিন্তু এ মাসে বিশেষভাবে এদিকে মনোযোগ দাও, এর তেলাওয়াত কর, এর তরজমা পাঠ কর, আর যেখানে যেখানে দরসের ব্যবস্থা আছে সেখানে লোকেরা দরসও শুনুক। কেননা, কোন কোন বিষয় সবার জানা থাকে না। তাই তোমাদের

জোর করে নিজেকে কষ্টে ফেলা পুণ্য নয় বরং আল্লাহ্তাআলার আদেশ-নিষেধ পালন করাই পুণ্য। নিজ পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা ঠিক নয়। যে আদেশ সুস্পষ্ট এর ওপর আমল করা উচিত। আর এটা খুবই সুস্পষ্ট আদেশ যে, রুগ্ন ও মুসাফির রোযা রাখবে না, তাই কল্যাণ এতে যেন, আদেশ পালন করা হয়, এটার মাঝে নয় যে, জোর করে খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।

এর গভীর মাহাত্ম্য ও অন্যান্য বুঝ-জ্ঞান লাভ হবে এবং সব বিষয় ও সব রকম আদেশ-নিষেধের ব্যাখ্যা জানা হবে যা তোমরা তোমাদের জীবনের অংশে পরিণত করতে পার। অন্য আয়াতে দ্বিতীয় বার তাগিদ দেয়া হয়েছে যেন রোযা রাখ আর মুসাফির ও রুগী এ দিনেগুলোতে যেন রোযা না রাখে এবং পরে পুরো করে। আর আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহ ও তোমাদের ওপর তাঁর যে দান এগুলোর শুকরিয়া আদায় করতে করতে আল্লাহ্তাআলার সামনে ঝুঁকো, তাঁর শোকরগুযার বান্দাতে পরিণত হও এবং এ শোকরগুযারীও তোমাদেরকে পুণ্যে প্রবৃদ্ধি দান করবে এবং তাকওয়ায়ও বাড়িয়ে দেবে।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, **'শাহরু রমাযানাল্লাযী উনযীলা ফিহিল কুরআনু** (সূরা বাকার ঃ ১৮৬) থেকে রমযান মাসের মাহাত্ম্য জানা যায়। সুফীরা লিখেছেন, এ মাস হৃদয় জ্যোতির্ময় হওয়ার উত্তম মাস। এতে অধিক সংখ্যায় কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) হয়ে থাকে। নামায আত্ম-শুদ্ধি করে থাকে। আর রোযা হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করে। আত্মশুদ্ধির অর্থ এই, নফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে দূরত্ব লাভ হয়ে যায়।" নফসে আম্মারা খারাবির দিকে ঝুঁকে দেয়ার আত্মা, এথেকে দূরত্ব লাভ হয়ে থাকে। আর আত্মার জ্যোতির্ময় হওয়ার অর্থ এই ঃ দিব্য-দর্শনের দরজা তার কাছে উন্মুক্ত হয় যেন খোদাকে দেখতে পায়"(মলফূযাত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬১-৫৬২, নব সংস্করণ)।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)] বলেছেনঃ অতএব রোযা রাখায় এবং কুরআন পাঠ করায় আর ইবাদত করায় অন্তর আলোকিত হয়। আল্লাহ্তাআলার সাথে নিকট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে। নামায আত্মাকে পবিত্র করে। এসব দিনে নামাযের ওপরও বিশেষভাবে জোর দাও যেন আত্মা অধিক পবিত্র হয় আর রোযায় অন্তরের আলো লাভ হয়। আর অন্তরের আলো হলো এই [যেভাবে তিনি (আঃ) বলেছেন] আল্লাহ্তাআলার সাথে এমন নিকট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় যেন খোদাকে দেখছে।

একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, ইবনে আদমের প্রতিটি আমল (কর্ম) তার নিজ সত্তার জন্যে হয়ে থাকে কেবল রোযা ছাড়া। অতএব রোযা আমার খাতিরে রাখা হয়ে থাকে আর আমিই এর প্রতিদান দেব। রোযা ঢালস্বরূপ। যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে তখন সে যেন যৌন সম্বন্ধীয় কথাবার্তা এবং গালি-গালাজ না করে আর তাকে যদি কেউ গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তাহলে এর জবাবে কেবল এটাই বলা উচিত, আমি তো রোযাদার। সেই সত্তার কসম! যাঁর ক্বাযা ও কুদরতের অধীনে মুহাম্মদের প্রাণ,

রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে কস্তুরীর সুগন্ধ থেকে অতি পবিত্র। রোযাদারের জন্যে দু'টি আনন্দ যা তাকে আনন্দিত করে। একটি তখন যখন সে রোযা খুল্লে তখন সে আনন্দিত হয় আর দ্বিতীয়ত যখন সে নিজ প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন নিজ রোযার কারণে আনন্দিত হবে।" (বুখারী কিতাবুস্ সওম)

অতএব এতে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তা এই ঃ আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, রোযা আমার খাতিরে রাখা হয়। তাই যে কাজ আল্লাহ্‌তাআলার খাতিরে করা হয় তাতে পার্থিব মিশ্রণ হতে পারে না। আর যে-কাজ আল্লাহ্‌তাআলার খাতিরে করা হয় এর প্রকাশ লোকদের সামনে বা তাদের দ্বারা প্রশংসা করানোর জন্যে হয় না বরং চেষ্টা এটাই হয়ে থাকে যেন পুণ্য লুক্কায়িত থাকে।আর যখন সে লোকদের আড়ালে পুণ্য করে যেতে থাকে তখন আল্লাহ্‌তআলা বলেন, আমি প্রতিদান হয়ে যাই। আবার [তিনি-(সঃ)] বলেন, রোযা ঢালস্বরূপ। সুরক্ষার এমন একটি সুদৃঢ় মাধ্যম রয়েছে যার পেছনে আশ্রয় নিয়ে তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করতে পার। আর তা সেই ভাবেই সম্ভব যে, রোযা রাখার সাথে সাথে আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতও কর এবং মন্দ থেকে আর ঝগড়া-বিবাদ থেকেও রক্ষা পাও। এমন কি কেউ তোমাদেরকে গালি দিলেও রাগ করবে না; ক্রোধ দেখাবে না, বরং বলবে, আমি রোযাদার। রমযানে প্রত্যেক পর্যায়ে; ঘরেও পরিবেশেও বাইরেও এবং বন্ধুদের মাঝেও এতদনুযায়ী আমল করলে সেই এক কথাই-গালির উত্তর দিবে না, ঝগড়া-বিবাদ করবে না। আমি মনে করি এতে অর্ধেকেরও বেশি ঝগগা-ঝাটি আমাদের সমাজ থেকে দূর হতে পারে। অতএব এসব লোকদের যে আনন্দ লাভ হয় এর মাঝে সবচে' বড় আনন্দ এই, [যেভাবে রসূলে করীম (সঃ)] বলেছেন, সে এ রোযার বদৌলতে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করবে। তাই এটাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল, রোযার পর এ আমল অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্যও লাভ হবে আর হতে থাকবে নচেৎ এ তো হবে সাময়িক পাওনা। রোযায় আমার নৈকট্য লাভ কর এর পর যা খুশী তাই কর, আল্লাহ্‌তাআলা এটাতো বলেন নি। বরং যেসব পুণ্য অবলম্বন কর এগুলোকে আবার স্থায়ীভাবে নিজ জীবনের অংশে পরিণত কর।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে আমলের সাতটি অবস্থা। দু'টি আমল এমন যা করার পর দু'টি কাজ অবশ্য-করণীয় হয়ে যায় আর দু'টি আমল এমন যার প্রতিদান সমান সমানই হয়ে থাকে। আর একটি আমল এমন হয়ে থাকে যার প্রতিদান আল্লাহ্‌তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না।"

দু'টি আমলের পর যে দু'টি কাজ অবশ্য-করণীয় হয়ে যায় তাহলো, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদতে রত থাকে আর কোন কিছুকে তাঁর শরীক মনে করে না। তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব (অবশ্য-প্রাপ্য) হয়ে যাবে। আর যে মন্দ আমল করবে তার এতটাই শাস্তি লাভ হবে । আর যে পুণ্য কাজ করার নিয়্যত করেছে ; কিন্তু তা সে করতে পারে নি তাকে পুণ্যকারীর সমান প্রতিদান দেয়া হবে আর যে কোন একটি পুণ্য করেছে তাকে ১০ গুণ প্রতিদান দেয়া হবে আর যে-ব্যক্তি নিজ ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে তার ব্যয়কৃত দিরহাম ও দিনার ৭শ' গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আবার [রসূলুল্লাহ্ (সঃ)] বলেন, রোযা এমন একটি আমল যা খোদা আয্‌যা ও জাল্লার সন্তুষ্টির খাতিরে করা হয়ে থাকে। এবং রোযাদারের প্রতিদান কেবল আয্‌যা ও জাল্লাই অবহিত" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, বিতাবুস্ সওম)।

অতএব যেভাবে অন্য জায়গায় (আল্লাহ্‌তাআলা) বলেছেন, এর প্রতিদান আমি স্বয়ং। যতটা চান আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন। ৭শ'গুণ বলে এটা বলে দেয়া হয়েছে, এর চেয়েও অধিক প্রতিদান হতে পারে। কেননা, রোযাদার নিজের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করে আর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে যখন চেষ্টা করে তখন আবার এ প্রতিদানের এ ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

"হযরত সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে মানুষ! তোমাদের প্রতি এক মহান ও কল্যাণমন্ডিত মাস সাহায্য করতে চাচ্ছে।এতে এমন এক রাত আছে যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। আল্লাহ্‌তাআলা এর রোযা রাখা বাধ্যকর করেছেন। আর রাতগুলোতে দাঁড়িয়ে (অর্থাৎ ইবাদত করা) অতিরিক্ত (পুণ্য) নির্ধারণ করেছেন..... **হুয়া শাহরুন আওয়ালুহু রহমাতুন ওয়া আওসাতুহু মাগফিরাতুন ওয়া আখিরুহু 'ইত্তাকু** মিনান্নার অর্থাৎ সেটা এমন এক মাস যার প্রথম দশক রহমত (কৃপা) মাঝের দশক মাগফিরাত (ক্ষমা)-এর কারণ আর শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তিদাতা.... আর যে-ব্যক্তি এতে কোন রোযাদারকে পান করায় তাকে আল্লাহ্‌তাআলা আমার হাউজ থেকে এমন শরবত পান করাবেন যে, জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত তার কখনও পিপাসা লাগবে না" (সহী ইবনে খুযায়েমাহ্, কিতাবুস্ সওম)।

অতএব এখানে এ কথারও অধিক ব্যাখ্যা হয়ে গেল যে, এ মাসের রোযা একতো ফরয তাই কোন বাহানা করা উচিত নয়। আর অন্যদিকে কেবল ক্ষুধার্ত থাকাও নয় বরং ইবাদতে আগে বাড়া উচিত। রাতগুলোতেও ইবাদতের জন্যে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত তবেই এসব প্রতিদানের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হবে, এসব লাভ করতে পারবে এবং সেই জান্নাতে প্রবেশ লাভকারী হবে, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌তাআলা দিয়েছেন।

হযরত সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দেন। আর বলেন, (এমন একটি বর্ণনার আরও অধিক কথা-বার্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর এতে বেশি কথা এই) যে-ব্যক্তি রমযানে কোন উত্তম স্বভাব নিজের মাঝে আত্মস্থ করে সে সেই ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যে তাছাড়া নিজ কর্তব্য সাধন করে ফেলেছে। আর যে-ব্যক্তি এ পবিত্র মাসে একটি কর্তব্য পালন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত হবে যে রমযান ছাড়া অন্য সময় ৭০টি কর্তব্য পালন করেছে। রমযান মাস ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত। এটা সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের মাস। আর এটা এমন এক মাস যাতে মু'মিনকে কল্যাণ দেয়া হয়। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, সহানুভূতি, ধৈর্যের মাস। তাই সব দিক থেকে

ধৈর্য থাকা আবশ্যক। এটা ধৈর্য ধারণ করার মাস। ধৈর্য কিভাবে হবে? রোযা রেখে আমরা খাবারের জৈবিক প্রয়োজনের দিক থেকেও ধৈর্য ধরে থাকি, লোকদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে থাকি। অসদাচরণের দিক থেকেও ধৈর্য ধারণ করে থাকি। নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে চুপ থেকেও ধৈর্য ধারণ করে থাকি। এ জন্যে করি, এটা আল্লাহ্‌র আদেশ যে, ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি করবে না। আর এতে এ আদেশ দেয়া হয়েছে, লোকদের সাথে সহানুভূতি, ধৈর্য ও উপেক্ষাসুলভ আচরণ কর তখনই এতে কল্যাণ লাভ হবে। আর এ কারণে, এ ধৈর্য ও সহানুভূতির কারণে, যুলুমের ওপর চুপ থাকার কারণে আল্লাহ্‌তাআলা যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করবেন তেমনি বলেছেন, পার্থিব জীবনোপকরণেও কল্যাণ বর্ষিত করবেন। আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে যে কাজ করে আল্লাহ্‌তাআলা অবশ্যই স্বয়ং তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

হযরত আবূ মাসউদ গাফফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি রমযান আরম্ভ হওয়ার পর একদিন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, "লোকেরা যদি রমযানের কল্যাণ সম্বন্ধে জানতো তাহলে আমার উম্মত এ কথায় সন্তুষ্ট হতো যেন সারা বছরই রোযা হয়।" এর ওপর বনূ খুযায়েমাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি বল্লো, "হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদেরকে রমযানের কল্যাণরাশি সম্বন্ধে অবহিত করুন।" সুতরাং তিনি (সঃ) বল্লেন, "নিশ্চয় জান্নাতকে রমযানের জন্যে বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সজ্জিত করা হয়। অতএব যখন রমযানের প্রথম দিন আসে তখন আল্লাহ্‌র আরশের নিচে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, কিতাবুস্ সওম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন রমযানের প্রথম রাত আসে তখন আল্লাহ্‌তাআলা নিজ সৃষ্টির প্রতি (দয়ার-অনুবাদক) দৃষ্টিপাত করেন। আর আল্লাহ্‌তাআলা কোন বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কখনও তাকে শাস্তি দেন না। আর আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। অতএব যখন রমযানের ২৯তম রাত আসে তখন আল্লাহ্‌তাআলা রমাযানের বিগত ২৮টি রাতের সমান লোকদেরকে ক্ষমা করে দেন" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, কিতাবুস্ সওম)।

এখানে ওয়া নাযারাল্লাহু ইলা 'আবদি লাম ইউ'আয্‌যিবহু আবাদান-এ হাদীসে 'আবদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হবে, তাঁর প্রতি ঝুঁকবে, তাঁর ইবাদত করবে। (আল্লাহ্) বলেন, যখন আমার বান্দা এমন হবে, যখন একবার আমি তাকে নিজ ভালবাসার চাদরে লেপ্টে নেব তাহলে পরে তাকে কোন শত্রু ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌তাআলাও তাকে জান্নাতের উত্তরধিকারী সাব্যস্ত করবেন। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে সত্যিকারের দাসে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

তিবরানীউল আওসতে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (রাঃ) বলেন, আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি (সঃ) বলছিলেন, রমযান এসে গেছে। এতে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানগুলোকে এতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। সেই ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস যে-ব্যক্তি রমযানকে পেল অথচ তাকে ক্ষমা করা হলো না। তাকে যদি রমযানে ক্ষমা করা না হয় তাহলে পরে কখন ক্ষমা করা হবে? (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, কিতাবুস্ সওম)।

তাই এতে আগের হাদীসেরও আরও ব্যাখ্যা হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌তাআলা এমন সব রকম উপকরণ সৃষ্টি করে দেয়া সত্ত্বেও যা দিয়ে একজন মানুষ আল্লাহ্‌তাআলার প্রকৃত বান্দায়ও পরিণত হতে পারে আবার সে যদি বান্দায় পরিণত না-ও হয়, রমযান থেকে কল্যাণ সাধন না করে, তাঁর ইবাদতকারী, তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্যকারী, পুণ্যকে বিস্তারদানকারীতে পরিণত না হয় তাহলে তিনি (সঃ) বলেছেন, এর ওপর কেবল দুঃখই প্রকাশ করা যেতে পারে, বরং আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলেছেন, তার জন্যে ধ্বংস যে, সব উপকরণ ও আল্লাহ্‌তাআলার কৃপা সত্ত্বেও নিজেকে নিজে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে নি। অতএব এ ক্ষমা লাভ করার জন্যে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হকের মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব আদায় করতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা এর সৌভাগ্য দিন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে-ব্যক্তি রমযানের রোযা ঈমানের অবস্থায় ও নিজের সত্তার হিসাব-বিশ্লেষণ করতে করতে রাখে তার বিগত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে আর তোমরা যদি জানতে পারতে যে, রমযানের কী কী অনুগ্রহ তাহলে তোমরা অবশ্যই এ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হতে যেন সারা বছর রোযা হয়" (আল্ জামেউস সহীহ মুসনাদ আল্ ইমামুর রবী' বিন হাবীব, কিতাবুস্ সওম)।

আগের হাদীসে যে বলা হয়েছিল, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ (লোককে) ক্ষমা করে–এখানে এর আরও ব্যাখ্যা হয়ে গেল যে, রোযা ঈমানের অবস্থায় যদি হয়ে থাকে, রোযাও রেখে থাকবে, আর ঈমানের অবস্থায় রেখে থাকবে, যেভাবে রাখার কথা ঠিক সেভাবে রেখে থাকবে, নিজের আত্মার মোহাসেবা (আত্ম-বিশ্লেষণ) করে থাকবে, নিজেকে নিজে দেখে থাকবে, এটা নয় যে, অন্যের মন্দের প্রতি দৃষ্টি দেবে, বরং নিজের হিসাব নিতে থাকবে, আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দায় পরিণত হবে তাহলে পরে সে হবে কল্যাণরাশিতে মন্ডিত ব্যক্তি।

নযর বিন শায়বান বলেন, আমি আবূ সালমাহ্ বিন আব্দুর রহমানকে বল্লাম, আপনি আমাকে এমন কথা বলুন যা আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে শুনেছেন। আর তিনি রমযান মাস সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। আবূ সালমাহ্ বিন আব্দুর রহমান বলেন, অবশ্যই আমাকে আমার বাবা বলেছেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কল্যাণময় আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের ওপর রোযা রাখা ফরয বা অবশ্য-কর্তব্য করেছেন। আমি তোমাদের জন্যে এর প্রতিষ্ঠা প্রবর্তন করে দিলাম। অতএব যে-কেউ ঈমানের অবস্থায় পুণ্যের নিয়্যতে এতে রোযা রাখে সে পাপ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যায় যে-ভাবে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।" অর্থাৎ একেবারে নিষ্পাপ শিশু হিসেবে (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুস সিয়াম)।

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন। "রোযা একটি ঢাল এবং আগুন থেকে রক্ষাকারী একটি সুদৃঢ় দূর্গ" (মুসনাদ আহমদ

বিন হাম্বল ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০২, বৈরুতে মুদ্রিত)।

এটা দূর্গ। কিন্তু এ ঢালের পেছনে এবং এ দূর্গের মাঝে কতদিন পর্যন্ত সুরক্ষা হতে থাকবে। কতদিন পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে-এর একটি ব্যাখ্যা অন্য আর একটি বর্ণনায় করে দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একে মিথ্যা ও গীবতের মাধ্যমে ছিঁড়ে না ফেলে। তাই, রমযানে রোযার যে কল্যাণরাশি সেই সময় লাভ হবে যখন এ ছোট ছোট মন্দ কর্মও, যা কখনও কখনও বাহ্যত ছোট বলে মনে হয়, সামান্য-মামুলী মনে করা হয়ে থাকে, সব রকম মন্দ কর্মকে শেষ করে না দেয়। এদের মাঝে বড় মন্দ কর্মটি হলো মিথ্যা। মানুষ একে মন্দ বলে অনুভব করে না, মিথ্যা বলা হলে এ ঢালকে ছিদ্র করে ফেলা হয়। লোকদের গীবত করা হয়, চোগলখুরী করা হয়, পেছনে বসে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এগুলোও তোমাদের রোযার ঢালকে ছিদ্র করে দিয়ে থাকে। তাই রোযা যদি সব রকম আবশ্যিক শর্ত পালন করে রাখা হয় তাহলে তা ঢালে পরিণত হবে। নচেৎ অন্য স্থানে [রসূল-(সঃ)] বলেছেন, তাহলে পরে রোযা কেবল না খেয়ে থাকা ও পান না করে থাকাই সার হবে যা মানুষ এমনিতেই সহ্য করে থাকে।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে সব রকম শর্তের সাথে রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করুন আর বিশেষভাবে আমরা যেন আল্লাহ্‌তাআলার (সন্তুষ্টির) খাতিরে রোযা রাখি। দুনিয়াকে দেখানোর জন্যে যেন রোযা না রাখি। কুপ্রবৃত্তির কোন বাহানা আমাদের রোযা রাখার পথে যেন প্রতিবন্ধক না হয় আর এ মাসে নিজের ইবাদতকেও জীবিত করি। আল্লাহ্ সৌভাগ্য দিন। আর যখন এ রমযানে পুণ্যের পথে বিচরণ করি তখন এ রমযানে এ দোয়াও করতে থাকি যেন পুণ্য কর্ম রমযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ না হয়ে যায় বরং সব সময় আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থাকে। আর আমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌তাআলার প্রিয়দের মাঝে গণ্য হই, তাঁর ভালবাসা লাভ করি এবং সব সময় তাঁর ভালবাসার দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়তে থাকে আর এ রমযান আমাদের জন্যে জামাতের জন্যে অসাধারণ বিজয় আনয়নকারী সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

এখন আমি ইউ, কে জামাতের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। বিগত দিনগুলোতে আমি কয়েকটি শহর পরিদর্শন করেছি। এতে বার্মিংহাম মসজিদেরও উদ্বোধন করা হয়। ব্রাড ফোর্ড মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়। খুবই ভাল স্থানে প্লটটি নেয়া হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। নিচে গোটা শহর দৃশ্যমান হয়। প্লট যদিও ততটা বড় নয় কিন্তু আশা করা যাচ্ছে নির্মাণের পর যথেষ্ট লোকের সংকুলান হবে। তারা covered এলাকাকে বাড়িয়ে নেবে। আর হার্টলেপুল মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়। এটাও খুবই সুন্দর জায়গা। কিন্তু এখানে জামাত ছোট। এখন সংখ্যায় কিছুটা বাড়ছে। দীর্ঘদিন থেকে কয়েকজন স্থানীয় লোক ছিলেন, যারা এসাইলাম নিয়েছে তারাও সেখানে গেছে। কিন্তু এসব লোকের এখনও বিশেষ কোন উপার্জন নেই। অথচ তাদেরকে ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা মসজিদ বানাতে হবে। মসজিদের নক্‌শা এবং মৌলিক পরিকল্পনা খুবই সুন্দর। মরহুম ডাঃ হামীদ খান সাহেব এ ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করে গেছেন যেন সেখানে মসজিদ তৈরী হয়। প্লট প্রভৃতি নেয়ার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সাহস ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন আর শেষ পর্যন্ত এজন্যে চেষ্টা চালাতে থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে প্রতিদান দিন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। এখন যখন আমি সেখানে জিজ্ঞেস করলাম, মসজিদ তো তৈরী হতে যাচ্ছে। অর্থের কমতির কারণে এর নক্‌শা একটু ছোট করতে চেয়েছিলেন। আমি তাদেরকে অর্থের কারণে নক্‌শা ছোট করতে বারণ করেছি। আল্লাহ্‌তাআলা, ইনশাআল্লাহ্ সাহায্য করবেন।

কিন্তু আমীর সাহেব আমাকে সফরের সময় বল্লেন, কোন সময় ইউ, কে-এর আনসারুল্লাহ্ (স্মরণ থেকেই বলেছিলেন কোন নির্ধারিতভাবে বলেন নি। এখন জানা নেই এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন কি করেন নি) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর কাছে এ অঙ্গীকার করেছিলেন, হার্টলেপুলে আমরা আনসারুল্লাহ্ মসজিদ বানাব। অঙ্গীকার করে থাকলে ঠিক আছে একে পুরো করুন। আর না-ও যদি করে থাকেন তাহলে এখন আমি এ কাজ আনসারুল্লাহ্ ইউ, কে-এর ওপর ন্যস্ত করছি। তারা সেখানে ইনশাআল্লাহ্ স্থানীয় লোকদেরকে যতটা সম্ভব সাহায্য হতে পারে করবেন। আর এই যে আসল মৌলিক নক্‌শা এতদনুযায়ী মসজিদ বানানো হবে। এ মসজিদে প্রায় ৫ লাখ পাউন্ডের মত ব্যয় হবে। তাই আনসারুল্লাহ্‌কে কিভাবে পুরো করতে হবে তারা তা পরিকল্পনা করে নিন এবং কোমর বেঁধে নিন। যা-ই হোক এদেরকে সাহায্য করতে হবে। সেখানকার জামাত খুবই ছোট্ট। আর ব্রাডফোর্ডে প্রায় তাদের ধারণা মতে ১.৬ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৬ লক্ষ পাউন্ডের (আমার ধারণা ও স্মরণ যদি ঠিক হয়ে থাকে) বিশাল মসজিদ তৈরী হয়ে যাবে। যদিও সেখানে ব্যবসায়ী লোক বেশি আর আমি আশা করি তারা নিজেদের পকেট থেকে অনেকাংশে শীঘ্র জমা করে মসজিদের কাজ পুরো করে নিবেন; কিন্তু কিছুটা শিথিলতা এসে যেতে পারে। কেউ কেউ অঙ্গীকার করে পুরো করতে পারেন না। কখনও কখনও বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই তাদের সাহায্যের জন্যে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউ,কে এ দায়িত্বে ন্যস্ত করছি। এরাও যেন তাদেরকে সাহায্য করে। এ এলাকায় একটি বড় উত্তম ব্যাপক জামাতের পরিকল্পনা রয়েছে। এটা, আমার আশানুযায়ী, জামাতের প্রসারের কারণ হবে। সেখানে এজন্যে তারাও এতে কিছু অংশ নেয় এবং লাজনা সব সময়ই কুরবানী করে আসছে। এখানে বায়তুল ফযল রয়েছে, এর জন্যেও অর্থ একত্র করেছিলেন যা প্রথম বার্লিন মসজিদের জন্যে ছিল পরে বায়তুল ফযল মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ইউ, কে লাজনাকে এ প্রসঙ্গে চেষ্টা করা উচিত। কেননা, আমার আকাঙ্ক্ষা, এ ছোট্ট মসজিদই এক বছরের মাঝে যেন তৈরী হয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্‌তাআলা সৌভাগ্য দিন। অতএব এ রমযান মাসে দোয়া ও কুরবানীর আবেগের সাথে এভাবেই দৃষ্টি দিন এবং চেষ্টা করুন। আল্লাহ্‌তাআলা সবাইকে সৌভাগ্য দিন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর ২৯-১০-২০০৪ থেকে ৪ নভেম্বর ২০০৪ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

তাকওয়ার উপর যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে সেই মসজিদকেই এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদের মসজিদ বলা যায়

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৭ই জুন ২০০৫ ইং তারিখে ক্যালগেরি (কানাডা) জামাতে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা জ্বীন এর আয়াত ১৯ তেলাওয়াত করে হুযূর খুতবা এরশাদ করেছেন।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿۱۹﴾

অনুবাদ ঃ "নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহ্‌রই জন্য সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেক না"। এটা ঐ শিক্ষা যাকে অনুসরণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মসজিদ নির্মাণ করে এবং ইবাদতের জন্য এটা করা হয়। আমাদের মসজিদগুলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতীক বা নিদর্শন হয়ে থাকে, এবং এমনই হওয়া উচিত। এ শিক্ষার আলোকে আপনারা দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর আল্লাহ্‌র ফযলে এখন ক্যালগেরি জামাতের মসজিদ নির্মাণের সুযোগ পাচ্ছেন; আগামী কাল যার ভিত্তি প্রস্তর রাখা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আল্লাহ্ করুন, আপনারা শীঘ্রই এর নির্মাণ কাজ শেষ করার সৌভাগ্য লাভ করুন। এবং যারা এর ব্যয়ভার বহনের অঙ্গীকার করেছেন তারা দ্রুত তাদের অঙ্গীকার পূরণ করুন। যারা এখনও এতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারাও যেন এতে অংশগ্রহন করতে পারে। আল্লাহ্ করুন এ মসজিদের নির্মাণ কাজে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর দোয়ার প্রতিফলন হোক যা তাঁরা কাবা গৃহের পুনঃ নির্মাণের সময় করেছিলেন। ঐ দোয়া থেকে তারাও মঙ্গল লাভ করুন যারা এ কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং যারা এখানে নামায আদায় করবেন তারাও ঐ দোয়ার কল্যাণ লাভ করুন। অপনাদের সন্তানেরা বংশানুক্রমিক এ মসজিদে তাকওয়ার পোশাক পরে আসতে থাকুক। আপনাদের এ মসজিদও যেন আঁহযরত (সঃ) এর অনুকরণে নির্মিত মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয় যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছিল। আঁহযরত (সঃ)এর ঐ মসজিদ এত বড় বরকত ও কল্যাণমন্ডিত মসজিদ যে এর তাকওয়া ভিত্তিক হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা - যেমন বলেছেনঃ "লা মাসজিদুন উসসিসা আলাত্ তাকওয়াহ্ মিন আওয়ালি ইয়াওমিন," (সূরা তাওবা ১০৮) যে, এটি এমন মসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছিল। ঐ মসজিদ এমন ছিল যার দেয়াল ছিল মাটির, চাল ছিল খেজুর পাতার এবং বর্ষার সময় ভেতরে বৃষ্টি পড়ে মেঝে ভিজে যেত। কিন্তু ঐ মসজিদে যারা নামায পড়তেন তারা তাকওয়াশীল ছিলেন এবং সিজদার সময় তাদের কপালে কাদা লেগে যেত। ঐ কাদাও তাদের তাকওয়ার শীলমোহর হোত। ঐ মসজিদের নামাযীগণ আল্লাহ্‌র পাওনা আল্লাহ্‌কে দিতেন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পাওনা তাদেরকে দিতেন। তারা মসজিদে বসে দরস দিতেন এবং শুনতেন। সেখানে যারা আসতেন তারা পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তারা নিজেদের তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে আসতেন। এ উদ্দেশ্য অর্জনে তারা খুব অধীর থাকতেন এবং তাদের এহেন আচরণকে আল্লাহ্‌তাআলা পছন্দ করতেন এবং ভালবাসতেন। কারণ তারা এর জন্য অস্থির থাকতেন। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য অস্থির হয়ে থাকতেন, তারা আঁহযরত (সঃ) এর কথা, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় নবী (সঃ) এর কথা শোনার জন্য অস্থির হয়ে থাকেতন। তাদের পবিত্র চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা। বলেছেন: "সেখানে যারা আসতেন তারা খুব আগ্রহ রাখতেন যে, তারা যেন পাক পবিত্র হয়ে যান এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।" (সূরা তাওবাঃ ১০৮)

অতএব, আমরা যদি মসজিদ নির্মাণ করতে চাই, অবশ্যই আমরা এ কাজ করব; যদি আমরা এ সকল আবাদ করতে চাই, এবং ইন্‌শাআল্লাহ্ অবশ্যই আবাদ করব; তা'হলে আমাদের এ সব মসজিদগুলোকে ঐ মসজিদের মত করে বানাতে হবে, যার ভিত্তি তাকওয়ার উপরে স্থাপিত। (আমরা এমন করেই বানিয়ে থাকি) ঐ সকল মসজিদগুলোতে যারা আসতেন তারা এবং সেখানে যারা ইবাদত করতেন, সেখানে বসতেন; তাদের লক্ষ্যস্থল ছিলেন আল্লাহ্‌তাআলা। তারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকতেন না; কোন প্রকার শির্‌ক গোপনেও তাদের মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারেনি। তারা আল্লাহ্‌র প্রত্যেক আদেশকে মান্য করতেন এবং সেরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। তাই তো আল্লাহ্‌তাআলা তাদের পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাদের সাথে ভালবাসাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভালবাসা কি ওখানেই শেষ হয়ে গেছে? আল্লাহ্‌র ভান্ডার কি খালি হয়ে গেছে? না। কারণ আল্লাহ্‌র ভান্ডার তো অফুরন্ত! সুতরাং তাঁর ভান্ডার যদি অফুরন্ত হয়ে থাকে, তাহলে আজও তিনি সেখান থেকে বিতরণ করতে পারেন এবং করেনও। শর্ত একটিই-আর তা এই যে, বান্দা যেন তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। এক আল্লাহ্‌কে ডাকে। মসজিদে যেন কেবল মাত্র

তাঁরই ইবাদত করা হয়। মসজিদ যেন তাঁরই স্মরণে পরিপূর্ণ থাকে। বান্দাদের ভিতরে যেন শির্ক লুকায়িত না থাকে। আল্লাহ্তাআলা নিজ বান্দাদেরকে দান করতে উদগ্রীব হয়ে থাকেন-কিন্তু বান্দা অনেক সময় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। বান্দা যখন আল্লাহ্র পানে তাকায় তখন তিনি খুব খুশী হন। মা যেমন নিজের হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেলে খুশী হয়-বুকে জড়িয়ে ধরে। (আল্লাহ্ও তেমনি খুশী হন।)

আমরা আহমদীরা আজ যুগ ইমামকে মেনেছি; তাঁর বয়আতের শৃঙ্খলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছি; এদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান যে, আমরা এ যুগ ইমামকে মান্য করে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) সারিতে শামীল হওয়ার আশ্বাস পেয়েছি। অতএব, "ওয়া আখারিনা মিনহুম" [সূরা জুমুআ-৪] গ্রুপের বরকত আমরা তখনই লাভ করতে পারব যখন এক আল্লাহ্কে ডেকে, তাঁর সামনে বিনত হয়ে, তাঁর প্রতি এগিয়ে যাবো; তাকওয়ার উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে জীবন যাপন করে যাবো। আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন করে যাবো।

আমাদের মসজিদগুলো আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশের পাঠদানকারী হবে। এখানে যারা আসবে তারা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য অস্থির হয়ে আসবে। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকল আহমদীদেরকে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা হবার, তাকওয়ার উপর দাড়াবার শক্তি দান করুন। তারা যেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসতে পারে। তারা হযরত নবী করীম (সঃ) এর এ হাদীসের আদেশে অংশ নিতে পারে-যেখানে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন; হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রেওয়ায়াত করেছেন; হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) বলেছেন। হযরত উসমান (রাঃ)র খেলাফতের আমলে তিনি যখন মসজিদে নববীকে বড় করে পুণ:নির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তখন কিছু মানুষ তাঁর এ ইচ্ছার বিপরীত মন্তব্য করলেন। তারা বলল, নবী (সঃ) এর হাতে নির্মিত মসজিদ যেমন আছে তেমনই থাকা উচিত। হযরত উসমান (রাঃ) বললেন,'আমি আঁহযরত (সঃ)কে বলতে শুনেছি, "মাম বানা মাসজিদান লিল্লাহে বানা আল্লাহু লাহু ফীল জান্নাতে মিছলাহু।" অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এখানে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্তাআলা তার জন্য পরকালে জান্নাতে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করবেন।" [মুসলিম কিতাবুল মাসজিদ]

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে। যখনই কোথাও মসজিদের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয় তখন তার মনে আসবে যে, আল্লাহ্কে খুশী করা উচিত। যদি আল্লাহ্কে খুশী করার উদ্দেশ্য হয় তা'হলে তার এ ইচ্ছা তাকওয়ার উপর দাঁড়িয়েই হবে। তারপর এ উদ্দেশ্যে যখন সে অর্থ ব্যয় করবে (মসজিদের জন্য চাঁদা) তখন তার মনে আল্লাহ্র ভয় থাকবে। তখন সে মসজিদ নির্মাণে চাঁদা দেবার সময় একথা মনে করবে না যে, 'অমুক অত টাকা দিয়েছে অতএব, আমি এত টাকা দেব।' তখন প্রতিযোগিতা করবে না কাউকে নিচু দেখবার জন্য। হ্যাঁ, তখন সে পুণ্যকর্মে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা তো বলাই আছে। পূর্ববর্তীগণও এমন প্রতিযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য এ প্রতিযোগীতা কাউকে নিচু করার জন্য নয়। অতএব যখন আল্লাহ্র জন্য গৃহ নির্মাণের প্রশ্ন আসবে তখন তাকওয়ার উপর দাঁড়িয়ে তা করতে হবে।

আমরা আহমদীরা আজ যুগ ইমামকে মেনেছি; তাঁর বয়আতের শৃঙ্খলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছি; এদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান যে, আমরা এ যুগ ইমামকে মান্য করে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) সারিতে শামীল হওয়ার আশ্বাস পেয়েছি। অতএব, "ওয়া আখারিনা মিনহুম" [সূরা জুমুআ-৪] গ্রুপের বরকত আমরা তখনই লাভ করতে পারব যখন এক আল্লাহ্কে ডেকে, তাঁর সামনে বিনত হয়ে, তাঁর প্রতি এগিয়ে যাবো; তাকওয়ার উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে জীবন যাপন করে যাবো। আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন করে যাবো।

আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ যে এ জামাতে এমন হৃদয়বান ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন-যারা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এমন মন নিয়ে অর্থ ব্যয় করছেন যেন আল্লাহ্তাআলা খুশী হন। অনেকে আমার সাথে দেখা করে বড় বিনয়ের সাথে দোয়ার জন্য বলেন যে, মসজিদ নির্মাণে আমার এতটা চাঁদা দেবার প্রতিশ্রুতি আছে, দোয়া করেন যেন শীঘ্রই ঐ প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারি। তারা বলেছেন, জামাত আমার কাছে এত টাকা প্রত্যাশা করছে, আমি যেন তার চেয়ে বেশি আদায় করতে পারি। এরা কেঁদে কেঁদে দোয়ার জন্য বলেন এবং চিন্তা ব্যক্ত করেন। আমরা এমন লোকদের সম্পর্কে বলতে পারি না যে, এরা দুনিয়ার মানুষকে দেখানোর জন্য এ কুরবানী করেছেন। বরং অবশ্যই তারা আল্লাহ্কে রাজি করানোর জন্য এ কুরবানী করেছেন। যতদিন পর্যন্ত আপনারা এমন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মালী কুরবানী করে যাবেন ততদিন আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানরা আল্লাহ্র ফযলের ওয়ারীশ হতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্। কারণ যারা আল্লাহ্র আদেশে আল্লাহ্কে খুশী করার উদ্দেশ্যে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।

হযরত উসমান (রাঃ)র বর্ণিত এই রেওয়ায়াত এবং তাঁর এ আমাল থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, খুব ভাল মসজিদ, পাকা দালান নির্মাণ করাও আঁহযরত (সঃ) পছন্দমত কাজ। আঁহুযূর (সঃ) প্রথম যুগে যখন মসজিদ বানিয়েছিলেন তখন অবস্থা এমন ছিল না যে, ভাল পাকা মসজিদ বানাবেন। তারপর হযরত উসমান (রাঃ)র যুগে তিনি ভাল পাকা মসজিদ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। বড় করে বানিয়েছিলেন।

কিন্তু আসল বিষয় তাকওয়া যার প্রতি সর্বদা প্রত্যেক আহমদী যেন দৃষ্টি রাখে। মসজিদ নববী যখন পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল তখন কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করা হয়েছিল তাকওয়ার ভিত্তিতেই করা হয়েছিল।

অতএব, প্রত্যেক আহমদী যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ্র পাওনা আল্লাহ্কে দিতে হবে, বান্দাদের পাওনা তাদেরকে দিতে হবে, তবেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন হবে। এবং জান্নাতের ওয়ারীশ হওয়া যাবে। এ জান্নাত ইহজীবনেই পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তীকালেও পাওয়া যাবে। প্রথম কথাতো হাদীসে আছে যে, মসজিদ নির্মাণ আল্লাহ্র জন্য যেন হয়। দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যেন আল্লাহ্র ইবাদত হয়; আল্লাহ্র যিকর হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন- যখন জান্নাতের বাগানে যাও তো সেখানে কিছু খাও,

কিছু পান কর। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)আরয করেছেন 'জান্নাতের সেই বাগান কি'। আঁহযরত (সঃ) বলেছেন, 'মসজিদসমূহ জান্নাতের বাগান।' আমি আরয করেছি–সেখানে খাওয়া বা পান করার অর্থ কি? হুযূর (সঃ) বলেছেন- 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হাম্‌দুলিল্লাহ্, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর পড়া।" [তিরমিযী; কিতাবুদ দাওয়াত]

আলহামদুলিল্লাহ্, আজ [বা আগমী কাল ও বলতে পারেন। তবে যখন নির্ধারণ হয়ে গেছে তখন আরম্ভ হয়েছে বলা যায়] আপনারাও ঐ সমস্ত ভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছেন যারা জান্নাতে বাগান বানাতে যাচ্ছেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের দ্রুত এ মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার শক্তি দান করুন। জান্নাতের এই বাগান (মসজিদ) এর সমস্ত রূপে গুণে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হোক; যেখানে আপনারা উপকৃত হবেন সেখানে দুনিয়ার মানুষেরাও দেখবে। গোড়াতেই আমি বলেছি, যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপরে রাখা হয়েছে সেই মসজিদই এমন স্থান যাকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদের মসজিদ বলা যায়। তাকওয়ার অর্থ অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও আল্লাহ্‌র ভালবাসা নিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা। তাঁর আদেশসমূহের মধ্যে তাঁর ইবাদত করা একটি আদেশ। তাঁর বান্দাদের তথা তাঁর সৃষ্টির সেবা করাও তাঁর একটা আদেশ। সুতরাং আমাদের ইবাদত ততক্ষণ নির্ভেজাল হতে পারে না, আমাদের কোন কুরবানীও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ আমরা তাঁর বান্দাদের (হক) অধিকার আদায় না করি। আমাদের আত্মীয়দের অধিকার দিতে হবে; পাড়া প্রতিবেশীদের অধিকার দিতে হবে। সমাজের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যও পালন করতে হবে। সকলের অধিকার আদায়ের কথা স্মরণ রাখতে হবে।

অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে যেখানে ইবাদতের মান উচু করার কথা ভাবতে হবে, সেখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনের কথাও ভাবতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, উন্নতি করতে হবে। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে তারপরই আমরা তাকওয়ার উপর দাড়িয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছি বলে ভাবতে পারব এবং আমাদের মসজিদের ভিত্তিও তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে বলে ভাবতে পারব। আর তখনই মসজিদের মিনার থেকে এক আল্লাহ্‌র ভালবাসার মহিমা ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–

"কুরআন শরীফের সমস্ত আদেশ-নিষেধের মধ্যে তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতার উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ এই যে, তাকওয়া সকল প্রকার অপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার শক্তি যোগায়। এবং প্রত্যেক পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে দৌড়াবার শক্তি দেয়। এত বেশি গুরুত্ব প্রদানের কারণ এই যে, তাকওয়া প্রত্যেক দরজায় মানুষের নিরাপত্তার রক্ষাকবজ স্বরূপ। এবং প্রত্যেক ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য দূর্গ স্বরূপ। সকল বিপর্যয় হতে রক্ষা পাওয়ার নিরাপদ দূর্গ। একজন মুত্তাকী মানুষ অনেক বেহুদা ঝগড়া-ঝাটি হতে রক্ষা পান যার মধ্যে অন্য লোকেরা জড়িয়ে পড়ে এবং কোন কোন সময় ধ্বংসের মুখে চলে যায়।" [আইয়ামুস সুলাহ্ রূহানী খাযায়েন; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৪২]

প্রত্যেক আহমদীকে যেখানে ইবাদতের মান উচু করার কথা ভাবতে হবে, সেখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনের কথাও ভাবতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, উন্নতি করতে হবে। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে তারপরই আমরা তাকওয়ার উপর দাড়িয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছি বলে ভাবতে পারব এবং আমাদের মসজিদের ভিত্তিও তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে বলে ভাবতে পারব। আর তখনই মসজিদের মিনার থেকে এক আল্লাহ্‌র ভালবাসার মহিমা ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী যে, তাকওয়া সকল অপকর্ম হতে বিরত থাকার শক্তি দেয়। অতএব, আল্লাহ্‌র ভয় এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার মাত্রা এতটা হওয়া চাই যে, কোন কথা যদি সামান্যও আল্লাহ্‌র কোন আদেশ বিরোধী হয় তাহলে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে; এভাবে অন্তরে মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হতে থাকবে এবং তাকওয়ার উপর দাঁড়ানোর শক্তি লাভ হতে থাকবে। এবং ছোট ছোট পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রেরণা লাভ করতে থাকবে। কারো কোন ক্ষতি করা কাউকে নিচু দেখাবার চেষ্টা করা, কারো বিরুদ্ধে কুৎসা বা মিথ্যা রটানো ইত্যাদির কথা মনে আসবে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–

"তাকওয়ার অনেকগুলো দিক আছে নিজের মর্জিকে বড় করে দেখা অহংকার; নিজেকে বড় করে তুলে ধরা –এসব থেকে বিরত থাকা, নিষিদ্ধ মাল গ্রহণ না করা, এবং চরিত্রহীনতা থেকেও রক্ষা পাওয়াও তাকওয়ার বিষয়।" [মলফূযাত: ১ম খন্ড, পৃঃ৫০] এসব থেকে দূরে থাকা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এখন দেখুন, যারা এসব থেকে বিরত থাকবে তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে। এভাবে তাকওয়া তার 'রক্ষাকবজ'- হয়ে দাঁড়াবে। অনেকে এসে বলেন যে, আমাকে বিশেষ কোন দোয়া বলে দিন যেন ঐ দোয়া করে আমার কঠিন সমস্যা দূর করতে পারি। এমন কথা অবশ্য দু'একজন আহমদীই বলে। কারণ তারা এ সমাজে বাস করে এবং তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত নয়। অনেকে মনোযোগ দেয়নি, অনেকের বুদ্ধির অভাব থাকে। কেউ কেউ নতুন আহমদী হয়েছে যারা এমন কথা বলে। নতুবা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে মান্য করে এবং সঠিক অর্থে হুযূর (আঃ) এর শিক্ষার উপর আমল করে আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) এর আদেশ পালন করে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাদের আর রক্ষা তাবিজের অভাব থাকে না। এ কথাটি বাহ্যতঃ ছোট মনে হয়। কিন্তু যখন কেউ সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, আল্লাহ্‌র অধিকার আল্লাহ্‌কে প্রদান করে এবং বান্দাদের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করে এবং নিজের মনের অবস্থা বিবেচনা করে তখন সে বুঝতে পারে যে, কথাটি ছোট মনে হলেও বাস্তবে অনেক বড়। আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ফলে সে আল্লাহ্‌র নজরে প্রিয় হয়ে যাবে; বান্দাদের প্রতি কর্তব্য পালনের ফলেও আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করবে। তারপর আর কিসের অভাব থাকবে তার কাছে যার জন্য সে তাবিজের প্রয়োজন বোধ করবে? অতএব, **উচ্চতর চারিত্রিক নমুনা দেখাও, ইবাদতের মান বাড়াও, তাহলে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে। যখন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে তখন তাঁর খাস ফযলও লাভ করবে। তখন আল্লাহ্ নিজ শক্তির নিদর্শন দেখাবেন।** হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেনঃ "ভাগ্যবান সে যে সাফল্য ও খুশীর সময় তাকওয়া অবলম্বন করে।" [মলফূযাত; পৃঃ ৯৯]

অতএব আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের জন্য ফযল নাযেল করুন, আপনারা আগের চেয়ে বেশি করে তাঁর প্রতি বিনত হোন, তাঁর সকল আদেশ মেনে চলুন। সাফল্য যেন আপনাদেরকে মন্দের দিকে নিয়ে যেতে না পারে; বরং তাকওয়ার পথে অগ্রসর হোন। আর্থিক স্বচ্ছলতা আপনাদেরকে

তাকওয়ার পথে এগিয়ে যেতে সহায়ক হোক। আজ পৃথিবীর কামনা বাসনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে অন্ধ হয়ে গেছে। পাপ পুণ্যের পার্থক্য ভুলে গেছে। আমাদের প্রাচ্যের দেশে পাপ করে গোপনে গোপনে, এখানে করে প্রকাশ্যে। কিন্তু অবস্থা একই রকম। এহেন পরিস্থিতে একজন আহমদীর কর্তব্য অনেক বেড়ে যায়। সূরা জুমুআর যে, আয়াত আমি উল্লেখ করেছি এতে আখারিনদের (পরবর্তীদের) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এদেরকে পূর্ববর্তীদের সাথে একত্রিত করা হবে। এতে একথাও বলা হয়েছে যে, এদের মধ্য হতে কিছু লোক এমনও হবে যারা যুগের নবীকে পেছনে একা ফেলে রেখে তারা খেলাধূলায় মেতে থাকবে যারা আঁহযরত (সঃ)এর আদেশ মেনে চলবে না। হুযূর আকরাম (সঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আবির্ভূত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)কে মানবে না। আমরা আহমদীরা তো হযরত মাহদী (আঃ)কে মান্য করেছি, তাঁর হাতে বয়আতে শামিল হয়েছি। সুতরাং খুব চিন্তাভাবনা করে সাবধানতার সাথে জগতের চাকচিক্যে ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে আল্লাহ্তাআলার সকল আদেশ-নিষেধকে মেনে চলতে হবে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে যেন আমরা ঐ রহমত ও বরকতের অংশ লাভ করতে পারি যা তাঁর সাথে জড়িত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত। নতুবা আরো বহু মসজিদ নির্মাণ করা হয় পৃথিবীতে, বাহ্যতঃ সকল ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্মও করা হয়। তাকওয়ার কথা সর্বত্র বলা হয়। অনেক মসজিদে আল্লাহ্তাআলার আদেশের বিপরীতে বেশি শিক্ষা প্রদান করা হয়। পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন দেখবেন। সবকিছু আল্লাহ্র নামে করা হয়। অন্যান্য মসজিদগুলো দালানের দিক থেকেও বড় বড় বিল্ডিং হয় সেগুলো। কিন্তু যুগ ইমামের অনুগত না হওয়ার কারণে তারা তাকওয়া শূন্য হয়ে পড়েছে। চিন্তা করলে বড় ভয় হয়, আমরাও যেন কোন কারণে প্রত্যাখ্যাত না হই। তবে আমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি; ঈমান রাখি; আল্লাহ্তাআলা তাঁর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর জামাতে ইবাদতকারী, বান্দাদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ; তাকওয়া অবলম্বনকারী, খেলাফতের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখে এমন লোকদের সৃষ্টি করতে থাকবেন। যারা সকল প্রকার কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবে ; ইন্শাআল্লাহ্। তারা আল্লাহ্ও তাঁর জামাতের সাথে জড়িয়ে রাখবে নিজেদেরকে– কখনই যুগ খলীফাকে একা হতে দিবে না। কিন্তু যদি কোন হতভাগা ঈমান প্রাপ্তির পরেও জাহেলীয়াতে (মুর্খতা) ফিরে যেতে চায় তাহলে তার দুর্গতি তাকে ডাকছে।

অতএব, আমি আবার আপনাদের বলছি-, আল্লাহ্ আপনাদের জন্য নিজ ফযল নাযেল করুন–, আপনারা আল্লাহ্র ফযলের বর্হিঃপ্রকাশ ঘটাবেন। অনেক সময় ধন-সম্পদ মানুষকে মন্দের মধ্যে নিয়ে যায়– এমন হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন; তাকওয়া অবলম্বন করুন। আল্লাহ্র ফযলের কারণে ইবাদতের মান উচু করুন, আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কর্তব্য পালন করুন নিজেদের অতীতের অবস্থার কথা মনে করে দেখুন এবং বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিন। অনেক আছেন আল্লাহ্তাআলা যাদেরকে এখানে এনেছেন এবং এখানে তাদেরকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন। শতগুণ বেশি দিয়েছেন। আপনারা সে কথা চিন্তা করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাবেন। তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবেন। তারপর আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে আরো অনেক বেশি আল্লাহ্র ফযলের বর্ষণ দেখবেন। যেমন তিনি বলেছেন–"লা ইন শাকারতুম লাআযিদান্নাকুম"। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই আরো বৃদ্ধি করে দেব। সুতরাং আপনারা যখন তাকওয়ার পথে চলতে থাকবেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টিকে স্মরণ রাখবেন; এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে যাবেন; এবং মসজিদের নির্মাণ কাজের জন্য এবং অন্যান্য মালী কুরবানীতে অংশগ্রহণ করবেন–এবং এভাবে আল্লাহ্র ফযলের বিকাশ ঘটাবেন এবং আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করে বলবেন, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার সামনে মাথা নত করেছি! তুমিই আমাদের বর্তমান অবস্থায় এনেছ! আমরা যা পেশ করছি তা খুবই সামান্য! তুমি যা দিয়েছ তা অনেক বেশি! এর ফলে আল্লাহ্তাআলা আরো বেশি ফযল করবেন– ইন্শাআল্লাহ্! আমি পূর্বেও বলেছি, অনেকে আছেন যারা বড় বড় কুরবানী করছেন। আবার অনেকে তেমন কিছু করছেন না। আমি তাদেরও বলছি যে, এ ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে দেখুন। তাকওয়া অবলম্বন করুন, ইবাদতের মাত্রা ও মান বৃদ্ধি করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন– আল্লাহ্ আপনাদের উপর কত বেশি ফযল করছেন তা হিসাব করে দেখুন। তারপর দেখুন আরো কত বেশি ফযল নাযেল হয়। আল্লাহতাআলা আপনাদের তাকওয়া এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সাহায্য করুন।

এ মসজিদ আপনারা যা নির্মাণ করতে যাচ্ছেন–এটি ইন্শাআল্লাহ্ অনেক লোককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, যদি জামাত বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে যেখানে জামাত বাড়াতে চাও সেখানে মসজিদ বানিয়ে দাও। দেখ, ঐ মসজিদই মানুষদেরকে আকৃষ্ট করে টেনে আনবে। কিন্তু মানুষের এ আগমন তখনই আহমদীয়াতের প্রসারের কারণ হবে যখন আপনারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করবেন। আপনাদের কথাবার্তা, আপনাদের চালচলন, আপনাদের কার্যক্রম পরস্পর বিরোধী যেন না হয়। আমি পূর্বে বিস্তারিত বলে এসেছি– আপনারা নিজেদের ইবাদতের মান বৃদ্ধি করুন। সকল মানুষের প্রতি আপনাদের কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করুন– এ জিনিস একদিকে আল্লাহ্র কৃপাদৃষ্টি আপনাদের উপর নাযেলের কারণ হবে। অপরদিকে এতদাঞ্চলে আহমদীয়াতের বার্তা প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। অতএব এ নিয়্যতে হলেও নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করুন। যারা আর্থিক কুরবানীতে বেশি অগ্রসর হতে পারছেন না তারা নিজেদের মাঝে সংশোধনের পবিত্র পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিন। তারা ইবাদতের মান উন্নত করতে চেষ্টা করুন। এ অঞ্চলে আহমদীয়াতের পয়গাম প্রচারের জন্য কাজ করুন। যদি শহরের মানুষ ধর্মের কথা শুনতে আগ্রহ না করে গ্রামের দিকে বেড়িয়ে পড়ুন। গ্রামাঞ্চলের লোক বন্ধুসুলভ-আচরণ

যদি জামাত বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে যেখানে জামাত বাড়াতে চাও সেখানে মসজিদ বানিয়ে দাও। দেখ, ঐ মসজিদই মানুষদেরকে আকৃষ্ট করে টেনে আনবে। কিন্তু মানুষের এ আগমন তখনই আহমদীয়াতের প্রসারের কারণ হবে যখন আপনারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করবেন। আপনাদের কথাবার্তা, আপনাদের চালচলন, আপনাদের কার্যক্রম পরস্পর বিরোধী যেন না হয়।

করবে, দেখা সাক্ষাতে আনন্দ প্রকাশ করবে। আহমদী বৃদ্ধ, আহমদী ছোট-বড়, মহিলা-পুরুষ সবাই যদি এ কাজ করে তাহলে জামাতের পরিচিতি অনেক বৃদ্ধি পাবে। যত বেশি পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে ততবেশি সৎস্বভাবের লোক জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এখানে এবং ভেনকোভারে মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হচ্ছে– ফলে এসব অঞ্চলে জামাতের পরিচিতি এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌র একজন নবীর মুখের কথা যে, "মসজিদ বানিয়ে দাও জামাত বিস্তার লাভ করবে।" আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ কথা পূর্ণতা লাভ করবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। শর্ত একটিই যে আমরা যেন এদিকে পুরোপুরি দৃষ্টি দিতে থাকি। অবহেলা না হয়। চেষ্টা চালাতে থাকবো। আসল কথা মনে রাখবেন তাকওয়া। তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে করবেন যা করবেন। আপনার সমস্ত কর্মকান্ড যেন তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে শক্তি দান করুন।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেনঃ

আমাদের জামাতের সদস্যদের নমুনা খুব ভাল হওয়া উচিত। বয়আতের পরও যদি কোন ব্যক্তির জীবনযাত্রা অপবিত্র এবং পঙ্কিল থেকে যায় যেমন বয়আতের পূর্বে ছিল এবং সে যদি আমাদের জামাতের সদস্য হয়ে মন্দ নমুনা প্রদর্শন করে এবং তার আচরণ এবং তার ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে দুর্বলতা থেকে যায় তাহলে সে যালেম বা অত্যাচারী। কারণ সে পুরো জামাতকে বদনাম করছে। আমাদেরকেও সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানাচ্ছে। মন্দ নমুনা দেখলে মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর উত্তম নমুনা যদি হয় তাহলে মানুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কোন কোন মানুষ চিঠি লিখে যে, যদিও আমরা আপনার সদস্য হই নি কিন্তু তবুও আপনার জামাতের লোকদের অবস্থা দেখে অনুমান করতে পেরেছি যে, এ জামাতের শিক্ষার মধ্যে নেকী আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ঐ সব লোকদের সাথে থাকেন যারা তাকওয়ার পথের পথিক হয় এবং পুণ্যবান হয়।"

হযরত (আঃ) আরো বলেছেন–

আল্লাহ্‌তাআলাও মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমের রেকর্ড প্রস্তুত করেন; প্রতিদিনের ডাইরী রাখেন। সুতরাং মানুষেরও উচিত প্রতিদিনের ডাইরী লিখে রাখা। তারপর বিবেচনা করে দেখা উচিত যে সে পুণ্যের পথে কতটা এগিয়েছে। মানুষের গতকাল ও আজ এক সমান হওয়া উচিত না। যে ব্যক্তির গতকাল ও আজ পুণ্যকর্মের দিক থেকে সমান রয়ে গেছে সে তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে –পরিপূর্ণ ঈমান রাখে সে কখনও বিনষ্ট হবে না। বরং একজনের খাতিরে লক্ষ লক্ষ প্রাণ রক্ষা পেয়ে যায়। একজন ওলী-আল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র বন্ধু)ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি সামুদ্রিক জাহাজে যাত্রা পথে ছিলেন। সমুদ্রে ঝড় উঠেছিল এবং জাহাজ ডুবে যাবার অবস্থা হয়েছিল। ঐ ওলী ব্যক্তির দোয়ার ফলে সকলে বেঁচে গিয়েছিল। তিনি যখন দোয়া করছিলেন তখন তিনি এলহাম-প্রাপ্ত হলেন যে, তোমার কারণে সকলকে বাঁচানো হোল। কিন্তু এসব কথা মৌখিক জমা খরচের মাধ্যমে লাভ করা যায় না। দেখ, তোমাকেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, "ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ্দারে"-[অর্থঃ যারা তোমার গৃহে বসবাস করে আমি তাদের সকলকে নিরাপত্তা দেব।] অথচ এর মধ্যে অনেক মহিলারাও আছে যারা খুব বেশি সচেতন নয়! মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির ও স্বভাবের হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ না করুন; এমন কেউ যদি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তাহলে শত্রুদের হাতে সমালোচনার সুযোগ এসে যাবে। আল্লাহ্‌তাআলা তো বলেছেন, "যারা ঈমানদার এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুম মিশ্রিত নয়।" সুতরাং ঈমান লাভের পর পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

আমাদের জামাতের সদস্যদের নমুনা খুব ভাল হওয়া উচিত। বয়আতের পরও যদি কোন ব্যক্তির জীবনযাত্রা অপবিত্র এবং পঙ্কিল থেকে যায় যেমন বয়আতের পূর্বে ছিল এবং সে যদি আমাদের জামাতের সদস্য হয়ে মন্দ নমুনা প্রদর্শন করে এবং তার আচরণ এবং তার ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে দুর্বলতা থেকে যায় তাহলে সে যালেম বা অত্যাচারী। কারণ সে পুরো জামাতকে বদনাম করছে। আমাদেরকেও সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানাচ্ছে। মন্দ নমুনা দেখলে মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর উত্তম নমুনা যদি হয় তাহলে মানুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, জামাতের দুর্বলদের মন্দ নমুনার কারণে আমাদের উপর মন্দ প্রভাব আসবেই। অন্যরা অযথা আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলবেই। এ কারণে আমার পক্ষ থেকে এটা উপদেশ যে, সৎ নমুনা বা নেক নমুনা দেখাতে চেষ্টারত থাক। যতক্ষণ ফেরেশ্‌তাগনের মত পবিত্র জীবন না হয়ে যাবে ততক্ষণ কি করে বলা যায় যে, সে পবিত্র হয়েছে! ফেরেশ্‌তাগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইয়াফ্‌য়ালুনা মা ইয়ামুরুনা" যা বলা হয় তারা তাই করেন," এমন হওয়া চাই। অর্থাৎ ফানা ফীল্লাহ্‌ হয়ে যেতে হবে। নিজের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ব্রতি হতে হবে। এভাবে তোমাদের উচিত তোমরা নিজেদের জন্য, স্ত্রীদের ও সন্তানদের জন্য, আত্মীয় স্বজনদের জন্য এবং আমাদের জন্য রহমতের কারণ হয়ে যাও। বিরোধীদের হাতে যেন কোন অভিযোগ করার সুযোগ না আসে। আল্লাহ্‌ বলেছেন, "তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের মধ্যে যুলুম করে। আবার অনেকে মধ্যম প্রকৃতির, আবার অনেকে পুণ্যকর্মে অনেক বেশি অগ্রগামী। (সূরা ফাতেরঃ ৩৩) প্রথম দুই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ এবং নিম্নমানের। আসলে "সাবেকুন বিল খায়রাত" অর্থাৎ পুণ্যকর্মে প্রতিযোগিতা করে একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী-হওয়া চাই। একই স্থানে থেকে থাকা কোন ভাল গুণ নয়। দেখবে, স্থির হয়ে থাকা পানি (প্রবাহ নেই যেখানে) এক সময় পচে যায়। পচা কাদার কারণে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহমান পানি সবসময় ভাল থাকে। পরিষ্কার হতে থাকে, স্বাদ ভাল থাকে। চলমান পানির নিচেও কাদা থাকে। কিন্তু পানিকে ময়লা করে না। মানুষেরও একই অবস্থা। একই অবস্থানে স্থির থাকা মারাত্মক হয়। প্রতিটি পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। পুর্ণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়া উচিত। নয়তো আল্লাহ্‌তাআলা সাহায্য করেন না। এভাবে মানুষ 'বে-নূর' বা নূর হারিয়ে ফেলে। ফলতঃ শেষে অনেক সময় ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অনেকে যারা ধর্মত্যাগী (মুর্তাদ) হয়েছে তাদের দেখবে যে, তারা নিজেরা পুণ্যকর্ম নিজ থেকে করে না। কখনও নামায পড়ে না। কখনও দেখবে জামাতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে, এভাবে মানুষের আত্মা অন্ধ হয়ে যায়।" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড; পৃ ৪৪৫-৪৪৬)

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর শিক্ষা অনুসারে তাকওয়ার পথে এগিয়ে যাবার শক্তি দান করুন। আমরা যেন ইবাদতের মান উঁচু করতে পারি। পুণ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারি। সবসময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে যেতে পারি। আল্লাহ্‌তাআলা সবাইকে সাহায্য করুন। আমীন।

(আলফযল, লন্ডন, ১লা জুলাই-২০০৫ইং)

অনুবাদ ঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ

নিজের ইবাদতকে জীবন্ত করুন। বাজামাত নামাযের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া দরকার। যদি এটা হয়ে যায়, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা খুব দ্রুত উন্নতি করব।

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২২শে অক্টোবর ২০০৪ ইং তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্ লন্ডনে প্রদত্ত।

তাশাহুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার আয়াত ১৮৭ তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা দিয়েছেনঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

অর্থাৎঃ এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল) আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সারা দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (বাকারা-১৮৭)

রমযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে যায় যে এটি বরকতপূর্ণ মাস, দোয়া কবুল হয় এজন্য সাধারণতঃ মানুষ মসজিদের দিকে বেশি যায়। মসজিদে উপস্থিতি বেড়ে যায়,ফযরের নামাযের উপস্থিতি অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেড়ে যায়, যা অন্য সময়ে মাগরিব অথবা এশার নামাযে হয়ে থাকে। বরং আমাকে এক ব্যক্তি লিখেছিলেন এটি রমযানের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিনের কথা যে, আজ মসজিদ ফযলে ফযরের উপস্থিতি এতো ছিল যে, হলঘর ভরার পরও মানুষ নামায পড়ার জন্য জায়গা খুঁজছিল। পৃথিবীর অন্যান্য শহর এবং দেশ থেকেও এই খবর আসছে যে, মা'শাআল্লাহ্ আজকাল আল্লাহ্‌তা'আলার ফযলে মসজিদগুলো বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে আনন্দ লাগছে যে মানুষ এদিকে মনোযোগী হয়েছে এবং দুনিয়াবী কাজকর্ম ছেড়ে, আরামদায়ক বিছানাকে ছেড়ে, সকালে উঠে, তাহাজ্জুদ পড়া রোযা রাখা এবং মসজিদে নামাযের জন্য আসা, এক খোদার ইবাদত করা, নিজের ভুল-ত্রুটির এবং গুনাহ্ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ মনোযোগ এজন্য সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা রমযানে তাঁর বান্দাদের উপর ফযল স্বরূপ ক্ষমার রাস্তা খুলে দেন। প্রত্যেকে চায় তা থেকে ফায়দা উঠাতে। খোদার রসূল (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি ঈমানের প্রয়োজনে এবং সওয়াবের নিয়্যতে রমযানের রাতগুলিতে উঠে নামায পড়ে তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী কিতাবুস সওম বাব ফাযলু মান কামা রামাযান)

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, প্রত্যেহ অগণিত ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। অনেক গুনাহ্ হয়ে থাকে। এজন্য প্রত্যেকের ইচ্ছা থাকে যে, আল্লাহ্‌আআলা যে সুযোগ দিয়েছেন তা থেকে ফায়দা উঠানোর এবং আল্লাহ্‌তাআলার কাছে নিজের গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা চাওয়া দরকার।

কিন্তু মনে রাখবেন ঈমানের চাহিদা পূরণ করে নামায পড়ার কথা হাদীসে বলা হয়েছে। ঈমানের চাহিদা কি? ঈমান কি চায়? কি এটাই যে এগারো মাস ইবাদতের দিকে, নামাযের দিকে ও বান্দার অধিকার আদায়ের দিকে মনোযোগ থাকবে না, আর ১২তম মাসে আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতের দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হবে যেন পূর্বের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। না! ঈমানের চাহিদা এটাই যে, যে ওয়াদা তুমি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে করেছো, তাঁর রসূল (সঃ) এর সঙ্গে করেছো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর সঙ্গে এক আহমদী যে ওয়াদা করে সেগুলো পূর্ণ করুন।

যেসব পরিবর্তন এক রমযানে সৃষ্টি হয়েছে তা নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের যেসব আদেশ-নিষেধ আছে তার উপর আমল করতে হবে। আর এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে ভবিষ্যতে সেই সব খারাপ অভ্যাস নিজের মধ্যে তৈরি হবে না। তাহলে খোদাতাআলার ভালবাসার দৃষ্টি পড়বে এবং পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হবে।

যেসব পরিবর্তন এক রমযানে সৃষ্টি হয়েছে তা নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের যেসব আদেশ-নিষেধ আছে তার উপর আমল করতে হবে। আর এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে ভবিষ্যতে সেই সব খারাপ অভ্যাস নিজের মধ্যে তৈরি হবে না। তাহলে খোদাতাআলার ভালবাসার দৃষ্টি পড়বে এবং পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হবে।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আর কুরআন করীমে রমযান ও রোযার বিষয়ে যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ এসেছে সেগুলো আয়াতের মাঝখানে রাখা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌তাআলা সেসব দিনে তাঁর বান্দার উপর ভালবাসার দৃষ্টি দিতে চান। তাদের ইবাদতের মান উঁচু করতে চান যেন সঠিক ইবাদতকারী দুনিয়াতে সৃষ্টি হতে থাকে।

আল্লাহ্‌তাআলা এটাই বলেন যে, যখন আমার বান্দা আমার বিষয়ে প্রশ্ন করে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) লিখেন, আমার বান্দা বলতে এখানে খোদা প্রেমিকগণ, আল্লাহ্‌তাআলার প্রেমিকগণ। এখন দেখুন প্রেমিক কারা হন। সত্যিকারের প্রেমিক তো তার পেমাস্পদের প্রত্যেকটি কথা মেনে নেয়। দুনিয়াবী প্রেমিকের মধ্যে তো ভাল-মন্দ থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার সত্তা এমন, যেখানে উপকার ছাড়া আর কিছুই নেই। উপকার আর উপকার। লাভ আর লাভ। প্রত্যেক প্রকার সততার উৎস, প্রত্যেক প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী। প্রত্যেক কষ্ট থেকে মুক্তিদানকারী। সে বলে আমার কাছে চাও আমি তোমার দোয়ার উত্তর দেব। সত্যিকারের প্রেমিক কি চায়? সত্যিকারের প্রেমিক তার প্রিয়জনের নৈকট্য চায়। এবং যখন নৈকট্য অর্জন হবে, একে অন্যের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হবে তখন একে অপরের ফায়দা পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা হবে।

এখানে তো একথা এক তরফা রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য লাভ হয় তো ফায়দা শুধু আমরা লাভ করবো এবং ফায়দা উঠানো পর্যন্ত বিষয় নয় বরং এভাবে যে, যখন তুমি তাঁর নৈকট্য পেয়ে যাবে তখন কিছু কুরবানী করতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

আল্লাহ্‌তাআলা সামনে আরও পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, কে আমার বান্দা, যাদের আমি উত্তর দিয়ে থাকি। বলছেন তারা আমার বান্দা, তারা আমার প্রেমিক, যারা আমার কথায় লাব্বায়েক বলে। আল্লাহ্‌তাআলা যে সমস্ত কথা বলেছেন যার উপর লাব্বায়েক বলতে হবে সেগুলো কি? সেসব হচ্ছে 'হকুকুল্লাহ্' আল্লাহর প্রাপ্য এবং 'হকুকুল ইবাদ' বান্দার প্রাপ্য আদায় করা। সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায় করে দেয়া এবং বান্দার প্রাপ্য আদায় করে দেয়া। স্থায়ীভাবে তাঁর ইবাদত করতে থাকুন। যে সব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকুন। যে সব বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো পালন করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন কুরআন করীমে সাতশত আদেশ আছে। যখন রমযানে কুরআন করীমের পড়াশুনা করবো, গভীরভাবে পড়াশুনা করবো, তরজমা পড়লে সেসব আদেশ-নিষেধও জানতে পারবো। যখন জানতে পারবো তখন সেসব আদেশ-নিষেধের উপর আমল করার চেষ্টা করার দরকার। এবং নেক নিয়্যতের সঙ্গে চেষ্টাকে নেকীতে বাড়িয়ে দিন। তো এটাই হচ্ছে সত্যিকারের প্রেমিকের লক্ষণ যে আল্লাহ্‌তাআলার বিধি-নিষেধের উপর লাব্বায়েক বলা, এর উপর আমল করা এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করা। আল্লাহ্‌তাআলা এমন নন যে, প্রত্যেক প্রেমিকের কাছ থেকে, এক রকমের কুরবানী চান। বরং প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের শক্তি অনুযায়ী কুরবানীর আদেশ

আল্লাহ্‌তাআলা এমন নন যে, প্রত্যেক প্রেমিকের কাছ থেকে, এক রকমের কুরবানী চান। বরং প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের শক্তি অনুযায়ী কুরবানীর আদেশ রয়েছে অথবা বিধি নিষেধের উপর আমল করার আদেশ রয়েছে। কিন্তু শর্ত এটাই যে, স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌তাআলার কথার উপর আমল করা এবং উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করা।

রয়েছে অথবা বিধি নিষেধের উপর আমল করার আদেশ রয়েছে। কিন্তু শর্ত এটাই যে, স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌তাআলার কথার উপর আমল করা এবং উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করা।

তারপর বলা হয়েছে আমার উপর ঈমান আন যেন হেদায়াত লাভ করতে পারো। কামেল (পরিপূর্ণ) ঈমান এটাই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সত্যিকারভাবে আনুগত্য করা। তারপর এটাও আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ যে, ঈমান এবং আমলে সালেহ্ এমন জিনিস যা একে অপরের সঙ্গে চলে। এজন্য যে আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমার কথায় লাব্বায়েক বলো অর্থাৎ আমলে সালেহ্ করো, নেক আমল করো। নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এরপর ইবাদতের মাধ্যমে দোয়া করো তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আমি তোমার নিকটে আছি। বলেছেন তাহলে আমি তোমার বন্ধু হব। যেমন বলা হয়েছে–

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌তাআলা সেসব লোকের বন্ধু হয়ে যান যারা ঈমান আনেন। (সূরা বাকারা ২৫৮) আল্লাহ্‌তাআলার এই বন্ধুত্ব এবং ঈমান তোমাদের আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য লাভ করাবে। এবং এরপর এটাও যে, নৈকট্য দান করতেই থাকবে, তাতে উন্নতি করতে থাকবে। এই নৈকট্য এমন নয় যে, এক জায়গায় থেমে থাকবে। তিনি দোয়াসমূহও শুনবেন। কিন্তু যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য এবং দোয়ার কবুলিয়্যত কিছু শর্তের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম তো এটাই যে, তাঁর বান্দা হয়ে থাকা। পরিপূর্ণভাবে তাঁর হয়ে যাওয়া। পরিপূর্ণভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাঁকে সমস্ত শক্তির উৎস মনে করতে হবে। তারপর যখন চাওয়ার দরকার তো তাঁর কাছেই চাইতে হবে। এ নয় যে, মনের মধ্যে ছোট ছোট খোদা তৈরি করে রাখো। যার মাধ্যমে কোন উপকার হয় তার মিথ্যা প্রশংসা শুরু করে দাও। অনেকের অফিসারদের পক্ষ থেকে স্বার্থ লাভ হয় তখন তারা তাদের এবং তাদের বাচ্চাদের খুশী করার জন্য অনেক সময় নামায পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলে এবং তাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। তো বলা হয়েছে যে এসব কথা নৈকট্য লাভের জন্য জরুরী যে, যখনই তুমি কোন কাজ করবে, দুনিয়াদারীর কাজ করছো তো তোমাদের এই দুনিয়াদারী, তোমাদের নামাযের জন্য যেন বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়; তোমাদের ব্যবসায়িক ব্যস্ততা যেন তোমাদেরকে ইবাদত থেকে গাফেল করে না দেয়।

হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রাঃ) সম্পর্কে এসেছে যে, একবার ইংল্যান্ডের রাণীর সঙ্গে তার মিটিং ছিল, তো কিছুক্ষণ পর তিনি অত্যন্ত অস্থিরভাবে নিজের ঘড়ি দেখছেন, পরিশেষে রাণী বুঝতে পেরে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন এক খোদা আছেন যাঁর আমি

ইবাদত করি। আমার এখন তাঁর ইবাদতের সময় হয়ে গিয়েছে। তো এই সাহস থাকা দরকার যে, বড় বড় অফিসার অথবা বাদশাহ্‌ও যদি হয় তার সামনে মাথা নিচু করবো না। আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের সামনে আর কোন অস্তিত্ব নেই। এসব হচ্ছে দুনিয়াবী জিনিস। শেষে তাঁকে (রাণীকে) তার কর্মকর্তাদের বলতে হলো যে, ভবিষ্যতে খেয়াল রাখবে যে তাঁর নামাযের সময় হলে নিজেরাই বলে দিও। তো এমন সাহস প্রত্যেক আহমদীকে দেখাতে হবে।

তারপর এটাও শর্ত যে রসূলের আনুগত্য করতে হবে। যেভাবে বিধি-নিষেধ দিয়েছেন, যে আদেশ করেছেন, যেভাবে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, আমাদের কাছ থেকে যে প্রত্যাশা করেন, যেভাবে কাজ করে দেখিয়েছেন সেভাবে করতে হবে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর গোলামীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তার উপর আমল করতে হবে। তারপর এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে এবং এক মু'মেনের এই বিশ্বাস থাকা দরকার যে,

খোদাতাআলা দোয়াকে শুনেন, এবং শুনার শক্তি রাখেন। আর যদি আবেগের মধ্যে এবং দোয়ার মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হওয়ার পরও যদি দোয়া কবুল না হয়, তাহলে আমাদের দোয়া করার পদ্ধতিতে কোন দুর্বলতা আছে অথবা অন্য কোন দুর্বলতা আছে এবং প্রাপ্যসমূহ আদায় না করা বাঁধা হয়ে রয়েছে। প্রাপ্যসমূহ আদায় না করার কারণে, মানুষের প্রাপ্য আদায় না করার কারণে, মানুষের উপর জুলম করার কারণে বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। অথবা আল্লাহ্‌তাআলার নিকট সে কাজ বা উদ্দেশ্য যার জন্য আমরা দোয়া করছি তা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। আল্লাহতআলা অনেক সময় নিজেও ফয়সালা করেন। অথবা যদি দুই ব্যক্তির অধিকারের বিষয় হয় তো আল্লাহ্‌তাআলা উত্তম জানেন কে বেশি হকদার (অর্থাৎ) পাওয়ার অধিকার রাখে। এজন্য প্রকৃত হকদারকে তার প্রাপ্য দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু নেক নিয়্যত এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করা হলে আল্লাহ্‌তাআলা এমন দোয়াকে নষ্ট করেন না। তা অন্য সময় কাজে লাগে, এই দুনিয়াতে অথবা পরকালে। এজন্য দোয়া চেয়ে ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমেই আসে। এজন্য সর্বদা ধৈর্যধারণ করা উচিত, এবং আল্লাহ্‌তাআলার কাছে চাইতে থাকা উচিত।

এক হাদীসে এসেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, "আল্লাহ্‌তাআলা তাদের দোয়া শুনেন যারা অধৈর্য হয় না। এবং এ বলে না যে, আমি অনেক দোয়া করেছি আর আল্লাহ্‌তাআলা শুনেন না। এ কুফরী এবং ঈমান থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার কথা। মু'মেনকে সর্বদা এটা থেকে বাঁচা দরকার আহমদীকে সর্বদা এসব জিনিস হতে বাঁচা দরকার।

নেক নিয়্যত এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করা হলে আল্লাহ্‌তাআলা এমন দোয়াকে নষ্ট করেন না। তা অন্য সময় কাজে লাগে, এই দুনিয়াতে অথবা পরকালে। এজন্য দোয়া চেয়ে ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমেই আসে। এজন্য সর্বদা ধৈর্যধারণ করা উচিত, এবং আল্লাহ্‌তাআলার কাছে চাইতে থাকা উচিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার কাছে দোয়া কবুল করা অথবা কবুল না করার বিষয়ে বলেনঃ এ দুই বন্ধুর মত বিষয়। কখনো বন্ধু তার বন্ধুর কথা মেনে নেয় আবার কখনো বন্ধুর কাছ থেকে নিজের কথা মানিয়ে নেয়। খোদার বিষয়টিও এরকম। কিন্তু বাহ্যিকভাবে এক মু'মেনের দোয়া যখন রদ হয়ে যায় তো এটিও প্রকৃতপক্ষে তার ফায়দার জন্য করা হয়। মোটকথা এটাই উদ্দেশ্য।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও বলেনঃ "অর্থাৎ যখন আমার বান্দা আমার বিষয়ে প্রশ্ন করে যে, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? তো তার উত্তর এটাই যে, আমি অনেক নিকটে আছি। অর্থাৎ কোন বড় প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমার অস্তিত্ব সহজ উপায়ে বুঝা সম্ভব। এবং অতি সহজেই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ তৈরী হয়ে যায়। আমাকে বুঝার এবং প্রমাণ লাভ করার অতি সাধারণ পদ্ধতি আছে। এবং এটাই হচ্ছে সেই দলিল যে, যখন কোন দোয়াকারী আমাকে ডাকে তো আমি তার কথা শুনি এবং ইলহামের মাধ্যমে তার সফলতার সংবাদ দিয়ে থাকি, যার মাধ্যমে না শুধু আমার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন হয় বরং আমার সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন হয়।" যখন আল্লাহ্‌তাআলা শুনে তখন উত্তরও দিয়ে থাকে, শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রমাণই দেয় না বরং এটাও দৃঢ়বিশ্বাসের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে, আমি সমস্ত শক্তির মালিক। কিন্তু এমন অবস্থায় মানুষ তাকওয়া এবং খোদাভীতি সৃষ্টি করে যেন আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পাই। এ খোদা-ভীতি এবং তাকওয়ার অবস্থা আল্লাহ্‌তাআলাকে আওয়াজ শুনানোর জন্য সৃষ্টি করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সে যেন আমার উপর ঈমান আনে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ মারেফত (তত্ত্বজ্ঞান) পাওয়ার আগেই যেন এ কথা স্বীকার করে যে, খোদা মওজুদ আছেন এবং সমস্ত শক্তি এবং কুদরতের অধিকারী। কেননা যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে আসে তাকেই ইরফান দেয়া হয়।" (আইয়ামুস সুলাহ্ পৃষ্ঠা ৩১ তফসীর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬৪৯)

তো বলা হয়েছে যে, যদি তাকওয়া, খোদাভীতি এবং আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায়কারী এবং আল্লাহ্‌র বান্দার প্রাপ্য আদায়কারী হয় তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আওয়াজ শুনবো। তারপর এটাও যে, ঈমান থাকবে। আমার উপরে এমন ঈমান থাকবে, এমন বিশ্বাস থাকবে যে, খোদা আছে এবং খোদার সত্তার এ বিশ্বাস প্রথমে মনের মধ্যে থাকতে হবে। মারেফাতে তাম্মা (পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান) অর্থাৎ গভীরে গিয়ে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খোদাতাআলার প্রত্যেক গুণের পরিচয় পাওয়ার পূর্বে এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে খোদা আছে। যেভাবে এসেছে যে, অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক জায়গায় বলেন 'গায়েব' খোদার নাম। তো বলা হয়েছে যে অভিজ্ঞতার পূর্বেই এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে খোদা আছে এবং অগণিত গুণাবলীর অধিকারী সর্বপ্রকার কুদরত এবং শক্তির অধিকারী। যখন এ বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্‌তাআলার দিকে অগ্রসর হবে, তাঁর সামনে ঝুঁকে যাবে তাঁর কাছে দোয়া করবে তাহলে তোমারা আল্লাহ্‌তাআলার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করবে, ইরফান (তত্ত্বজ্ঞান) অর্জিত হবে, অভিজ্ঞতা হবে, কবুলিয়্যতে দোয়ার

নিশান দেখতে পাবে। এসব জিনিস এবং মান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের বলেছেন এবং যা তিনি তাঁর জামাতে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এ দৃঢ়তার সঙ্গে যখন আমরা দোয়া করবো তো অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্তাআলা শুনবে। এ নয় যে, মুখে তো বলে দিলাম যে, আমাদের আল্লাহ্তাআলার সত্তার উপর পরিপুর্ণ বিশ্বাস আছে এবং ঈমান আছে; কিন্তু তাঁর বিধি-নিষেধের উপর আমল নেই। নামায বৎসরের পর বৎসর শুধুমাত্র রমযানে পড়ার চেষ্টা জারি আছে বা থাকবে। জামাতের উপরে আল্লাহ্তাআলার ফযল এবং অনেক বড় ফযল যে, অন্যের তুলনায় জামাতের একটা বড় অংশ নামায আদায়কারী এবং নামাযী। কিন্তু বা-জামাত নামায এখন অনেক বেশি জরুরী। এর মধ্যে অনেক কমতি রয়েছে।

এ রমযানে আমাদের আরেকবার এ সুযোগ দিচ্ছে খোদার সামনে ঝুঁকার যেভাবে ঝুঁকার হক্ব রয়েছে। তাঁর ইবাদত করুন যেভাবে ইবাদত করার কথা তো আল্লাহ্তাআলা নিশ্চিতভাবে উত্তর দিবেন। এবং এ প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা সেসব ইবাদতকে সর্বদা জীবন্ত রাখবো। যদি এটা হয়ে যায় তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ্তাআলা জামাতের বৎসরের উন্নতি এক দিনে হতে দেখবো। এজন্য আমি এটাই বলবো যে নিজের ইবাদতকে জীবন্ত করুন। অন্যের কাছে দোয়া করানোর পরিবর্তে (অনেক মানুষের অভ্যাস থাকে যে, নিজ নিজ হালকা বানিয়ে নেন সেখানে দোয়া করানোর জন্য যান এবং নিজে মনোযোগ দেন না) নিজে আল্লাহ্তাআলার সত্তার কুদরতের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, পীর হোন। পীরের পূজারী হবেন না। এখানে একটি কথা বলে দিচ্ছি যে, অনেক রিপোর্ট এমন আসে, খবর আসে পাকিস্তানে এবং অন্য জায়গাতেও এবং রাবওয়াতেও যে, অনেক আহমদীরা নিজের দোয়াকারী বুযুর্গ তৈরি করে রেখেছেন। এবং সে বুযুর্গ আমাদের মতে নামে মাত্র তিনি পয়সা নিয়ে অথবা তা'বিজ দিয়ে থাকেন অথবা দোয়া করে দেয় যে, ২০ দিনের ওষুধ নিয়ে যাও ২০ দিনের পানি নিয়ে যাও অথবা তা'বিজ নিয়ে যাও। এসব কিছুই অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত। আমার মতে সে ব্যক্তি আহমদী নয়, যারা তা'বিজ করেন। এমন মানুষের মাধ্যমে দোয়া করানো ব্যক্তি মনে করেন আমি যা ইচ্ছা করবো, মানুষের অধিকার হরণ করবো, আমি তো আমার বুযুর্গের মাধ্যমে দোয়া করিয়ে নিয়েছি, এজন্য ক্ষমা হয়ে গেছে, অথবা আমার কাজ হয়ে যাবে। আল্লাহ্তাআলা তো বলেন যে, মু'মেন হতে হলে আমার ইবাদত কর, আর তোমরা বলছ পীর সাহেবের দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট। এ সব শয়তানী দৃষ্টিভঙ্গী, এথেকে বাঁচুন। মহিলাদের মধ্যে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে সেখানেও অনেক সময় এসব হয়ে থাকে। এজন্য অঙ্গ সংগঠনগুলো এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিন এবং এমন ব্যক্তি যারা বে'দাত ছড়াচ্ছেন, তাদের প্রতিকার করার চেষ্টা করুন। যদি একজনও এমন চিন্তার মানুষ থাকে তো নিজের পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। শুধু অঙ্গসংগঠনগুলো নয় বরং জামাতী নেযাম এ বিষয়ে খোঁজ নিবে, যেভাবে আমি বলেছি যদি একজন ব্যক্তিও হয় তো তারা প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। এবং শয়তান তো আক্রমণ করার সুযোগে থাকে। আল্লাহ্তাআলার কথা শুনার পরিবর্তে এভাবে কিছু শিরককারী হয়ে যাবে। আল্লাহ্তাআলা সবাইকে এর থেকে রক্ষা করুন। কিন্তু আমি আবারও বলছি এ রোগ একজনের মধ্যে হলেও জামাতের মধ্যে তা সহ্য করা হবে না। আল্লাহ্তাআলা তো এ দোয়া শিখিয়েছেন যে, প্রত্যেকে নিজের সীমার মধ্য থেকে এ দোয়া করবে যে আমাকে মুত্তাকীদের ইমাম তৈরী কর। যুগ খলীফাও এ দোয়া করে থাকে যে, আমাকে মুত্তাকীদের ইমাম তৈরী কর। অথচ এর পীরপূজারী গ্রুপ বলছে আমরা যা ইচ্ছা করবো আমাদের পীর সাহেবের দোয়ায় আমরা ক্ষমা পেয়ে যাবো, এতো নাউযুবিল্লাহ্ খৃষ্টানদের কাফ্ফারার শিক্ষা আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যাবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি শুরু হয়ে যাবে। যতো ছোট আকারই হোক না কেন এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া দরকার। এখন থেকেই দাবিয়ে রাখতে হবে। প্রত্যেক আহমদী এ প্রতিজ্ঞা করবে যে এ রমযানে নিজের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্তাআলা বিপ্লবী পরিবর্তন সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক আহমদী এ চেষ্টা করবে নিজে সেসব দোয়া এবং আল্লাহ্তাআলার নৈকট্যের মজা যেন লাভ করে, অন্যদের পিছনে যাওয়ার পরিবর্তে।

যখন দোয়ার মাধ্যমে নেকীর রাস্তা আল্লাহ্তাআলার কাছে চাইবে তো অতীতের পরীক্ষাসমূহ থেকে বাঁচার উপকরণ তৈরী হবে এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষাসমূহ থেকেও বাঁচতে পারবে। সুতরাং দোয়া করা এক স্থায়ী আমল যার মাধ্যমে রহমতের দরজা খুলতে থাকবে।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আঁহযরত (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যাদের জন্য দোয়ার দরজা খোলা হয়েছে বস্তুতঃপক্ষে তার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়েছে। আল্লাহ্তাআলার কাছ থেকে যেসব জিনিস চাওয়া হয় তার মধ্য থেকে তার কাছে নিরাপত্তা চাওয়া বেশি প্রিয়" রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে সমস্ত বিপদ এসেছে এবং যে সমস্ত বিপদ এখনও আসেনি এর জন্য দোয়া করলে উপকার হয়। হে আল্লাহ্র বান্দা তোমাদের উপর ফরয যে তোমরা দোয়াকে অবলম্বন কর।" (তিরমিযি কিতাবুত দাওয়াত বাব মা যায়াফি য়ুকুদে তাসবিহ্ বিল্লাহ্)

বলা হয়েছে যে, সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে নিরাপত্তা। অর্থাৎ নেকী, পবিত্রতা খারাপ কথা থেকে বিরত হওয়া। এসব জিনিস আল্লাহ্তাআলার নিকট সবচেয়ে বিশি পছন্দের। যখন দোয়ার মাধ্যমে নেকীর রাস্তা আল্লাহ্তাআলার কাছে চাইবে তো অতীতের পরীক্ষাসমূহ থেকে বাঁচার উপকরণ তৈরী হবে এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষাসমূহ থেকেও বাঁচতে পারবে। সুতরাং দোয়া করা এক স্থায়ী আমল যার মাধ্যমে রহমতের দরজা খুলতে থাকবে। এবং আমরা অতীতের এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষাসমূহ থেকে নিরাপদ থাকবো।

রহমত এবং ফযলের দরজা মসজিদে নামাযের জন্য আগমনকারীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য মসজিদে আসার এবং যাওয়ার দোয়া শিখানো হয়েছে, যেন মসজিদের ভিতরে এবং বাহিরে আল্লাহ্তাআলার ফযলের, রহমতের এবং বরকতের ছায়া থাকে। আমাদের কোন কাজ যেন আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টির বিপক্ষে না হয়। নিজের দুনিয়াবী কাজ কর্মে অথবা

দুনিয়াবী ব্যবসা-বাণিজ্যে খোদাতাআলার কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার কারণে তার উপর রহমত বর্ষিত হবে। এ রহমতের দরজা সর্বদা খোলা থাকবে কেননা সে দুনিয়াবী কাজেও নেকীকে জারি রাখবে, নেক কথাকে বিস্তৃতিদানকারী হবে, এবং তার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে। তো এসব জিনিস যা খোদাতাআলার নৈকট্য লাভ করার কারণ হয়ে থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, **আঁহযরত (সঃ) বলেছেনঃ আমাদের প্রভু প্রত্যেক রাতে নিকটস্থ আকাশে নাযেল হন। যখন রাতের এক অংশ বাকী থাকে তখন আল্লাহ্তাআলা বলেনঃ কে আছে আমাকে ডাকে এবং আমি তাকে উত্তর দিব? কে আছে যে, আমার কাছে চায় এবং আমি তাকে দান করবো? কে আছে যে, আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং তাকে আমি ক্ষমা করে দেবো?** (তিরমিযি কিতাবুদ্দাওয়াত বাব মা যায়া ফি য়ুকদি তাসবিহ্ বিল্লাহ্)

এখানে রমযানের সাথে কোন শর্ত নেই, এখানে তো রমযান ছাড়া কথা হচ্ছে যে, যখনই কোন বান্দা আমার কাছে চায় তো আমি তাকে মাফ করে দেই, তাকে দান করি, তার কথার উত্তর দিয়ে থাকি। তো এ রমযানে আল্লাহ্তাআলা ইবাদতের অভ্যাস করার জন্য এক সুযোগ দিয়েছেন। এজন্য প্রত্যেক আহমদীকে স্থায়ী অভ্যাস গড়ার জন্য চেষ্টা করা দরকার যেন আল্লাহ্তাআলার ভালবাসার দৃষ্টি সবসময় আমাদের উপর পড়ে থাকে।

তারপর এক বর্ণনায় এসেছে আঁহযরত (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ্তাআলা কষ্টের সময় তার দোয়া কবুল করুক , তো সে যেন নিরাপদ এবং আরামের সময় বেশি বেশি দোয়া করে। (তিরমিযী কিতাবুদ্দাওয়াত বা দাওয়াতুল মুসলেমু মস্তাজাবাহ্)।

সুতরাং আমি যেভাবে বলেছি যে, স্থায়ীভাবে সাধারণ অবস্থাতেও মনোযোগ থাকা দরকার এ হাদীসেও আমাদেরকে বলছে যে শুধু বিপদের এবং প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্কে ডেকো না বরং স্থায়ীভাবে তাঁর সামনে ঝুঁকতে হবে। তাঁকে ডাকতে থাকো। তাঁর বিধি-নিষেধের উপর আমল করতে থাকো। আল্লাহ্তাআলা তাঁর বান্দার কষ্টকে সহ্য করতে পারেন না; তোমার এ অবস্থা দেখে তোমার কষ্ট দূর করার জন্য তোমার দিকে দৌড়ে আসবেন।

এক বর্ণনায় এসেছে আঁহযরত (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্তাআলা বলেনঃ আমি বান্দার ধারণা অনুযায়ী তার সঙ্গে ব্যবহার করি। যে সময় বান্দা আমাকে স্মরণ করে, আমি সে সময় তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে তার মনে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি। যদি সে আমার যিকর কোন মাহফিলে করে তাহলে আমি সে ব্যক্তির যিকর তার থেকে উত্তম মাহফিলে করি। যদি সে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত বরাবর আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত বরাবর যাবো। যদি সে আমার দিকে এক হাত বরাবর আসে তাহলে আমি তার দিকে দুই হাত বরাবর যাবো। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাবো। (তিরমিযী কিতাবুদ্দাওয়াত বাব ফি হুসনেজ্জান বিল্লাহে আজ্জা ও যাল্লা)।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে এ চেষ্টা করা দরকার যে, আল্লাহ্তাআলার যিকরের মাধ্যমে নিজের জিহ্বাকে ভেজা রাখা এবং এই চেষ্টা থাকা দরকার যে আমাদের প্রত্যেক কর্ম,

প্রত্যেক আহমদীকে এ চেষ্টা করা দরকার যে, আল্লাহ্তাআলার যিকরের মাধ্যমে নিজের জিহ্বাকে ভেজা রাখা এবং এই চেষ্টা থাকা দরকার যে আমাদের প্রত্যেক কর্ম, প্রত্যেক আমল এবং আল্লাহ্তাআলার দিকে অগ্রসরমান প্রত্যেক পদক্ষেপ এমন হবে যার কারণে আল্লাহ্তাআলা দৌড়ে আমাদের পাশে আসবেন এবং আমাদেরকে ভালবাসার চাদরে জড়িয়ে রাখবেন।

প্রত্যেক আমল এবং আল্লাহ্তাআলার দিকে অগ্রসরমান প্রত্যেক পদক্ষেপ এমন হবে যার কারণে আল্লাহ্তাআলা দৌড়ে আমাদের পাশে আসবেন এবং আমাদেরকে ভালবাসার চাদরে জড়িয়ে রাখবেন।

হযরত ইব্রাহীম বিন সা'দ (রাঃ) পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আঁহযরত (সঃ) বলেছেনঃ যান্নুন অর্থাৎঃ হযরত ইউনুস মাছের পেটে যে দোয়া করেন তা হচ্ছে– লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যালিমিন। এই দোয়াকে যে মুসলামন বিপদের সময় করবে, আল্লাহ্তাআলা তার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন। (তিরমিযি কিতাবুদ্দাওয়াত বাব মা যায়া ফি য়ুকদি তাসবিহ্ বিল্লাহ্)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ "এথেকে এক শিক্ষা পাওয়া যায় তাকদীরকে আল্লাহ্ পরিবর্তন করে দেন এবং কান্নাকাটি এবং সদকা [হযরত ইউনুস (আঃ)এর জাতির যে অবস্থা হয়েছিল এটা সে বিষয়ে] ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত শাস্তিকে দূর করে দেয়। অর্থাৎ যদি কোন ফয়সালা হয়েও যায় (আযাবের) তবুও তিনি পরিবর্তন করেন। সুতরাং সদ্কা খয়রাত এবং দোয়া বিপদকে দূর করে দেয়।

এরপর তিনি বলেনঃ "আমি তোমাদের এটা বুঝাতে চাই যে ব্যক্তি বিপদের পূর্বেই দোয়া করে, ইস্তেগফার করে এবং সদ্কা দিয়ে থাকে, আল্লাহ্তাআলা তাদের উপর রহম করেন এবং আযাব থেকে রক্ষা করে থাকেন। আমার এসব কথাকে গল্পের আকারে শুনোনা। আমি আল্লাহ্তাআলার উপদেশ অনুযায়ী বলছি নিজের অবস্থার উপর চিন্তা করো, নিজে এবং বন্ধুদেরকে দোয়াতে লেগে যাওয়ার জন্য বলো। ইস্তেগফার, আযাবে ইলাহী এবং শক্ত বিপদে ঢাল এর কাজ করে যাকে (অর্থাৎ ঢালের কাজ করে থাকে) কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা বলেনঃ মা কানা আল্লাহু মু'আয্যিবাহুম- ওয়াহুম ইয়াসতাগ ফিরুন

এজন্য যদি তুমি আযাবে ইলাহী থেকে রক্ষা পেতে চাও তাহলে ইস্তেগফার বেশি বেশি পড়ো।"

(মলফূযাত ১ম খন্ড ১৩৪ পৃঃ নতুন সংস্করণ)

এ আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই যে, আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের উপর আযাব দিবেন, যখন তারা ক্ষমা প্রর্থনা করছে।

তারপর এক বর্ণনায় এসেছে আঁহযরত (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্তাআলা বড়ই লজ্জাশীল। বড়ই করীম এবং দানশীল যখন বান্দা তাঁর কাছে দুই হাত উঁচু করে তখন তিনি তাদের খালি হাতে ফেরত দিতে লজ্জা বোধ করেন। অর্থাৎ সততার সঙ্গে যে দোয়া করা হয় তাকে রদ করা হয় না, কবুল করা হয়। (তিরমিযি কিতাবুদ্দাওয়াত বাব ইন্নাল্লাহা হাইয়ি করীম)

এর অর্থ এটাই যে, আল্লাহ্তাআলার কাছে সততার সঙ্গে চাওয়া দরকার। অতীতের গুণাহ্

এবং ভুলের জন্য মাফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য নেকীর উপর কায়েম থাকার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার নিকট সাহায্য চাওয়া দরকার। আর এজন্য চেষ্টা করা হলে আল্লাহ্‌তাআলা সাহায্য করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ "যেভাবে খোদাতাআলার কিতাবে নেক লোক এবং মন্দ লোকের পার্থক্য করা হয়েছে এবং তাদের আলাদা আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়েছে, এভাবে খোদাতাআলার প্রাকৃতিক নিয়মেও ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যার মধ্যে একজন খোদাতাআলাকে কল্যাণের উৎস মনে করে দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে শক্তি এবং সাহায্য প্রার্থনা করে এবং অপরজন নিজের তদ্বীর এবং নিজের শক্তির উপর ভরসা করে দোয়াকে হাসির বস্তু মনে করে বরং খোদাতাআলার প্রতি বিমুখ এবং অহংকারের অবস্থায় থাকে। যে ব্যক্তি সমস্যা এবং বিপদের সময় খোদার কাছে দোয়া করে এবং তাঁর কাছ থেকে বিপদ থেকে মুক্ত হতে চায় সে শর্ত হচ্ছে–দোয়াকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করা।" এখানে শর্ত এটা লাগানো হয়েছে যে, দোয়াকে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছাবে। "খোদাতাআলার কাছ থেকে প্রশান্তি এবং প্রকৃত সুখ ভোগ করে। এবং যদি ধরে নেই সে উদ্দেশ্য অর্জন না হয়, তাহলে অন্যরকম প্রশান্তি এবং আরাম খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তাকে দান করা হয়।" যদি দোয়া কবুল না হয় তো আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান করা হয়। বস্তুতঃ কাজ সেভাবে হয় না যেভাবে তার ইচ্ছা থাকে। "এবং সে কখনোই বিফল হয় না। এবং সফলতা ছাড়াও তার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস বেড়ে যায়।" (আইয়ামুসসুলাহ্ রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড পৃঃ২৩৬-২৩৭)

যে রাতে উঠে এবং যতো অমনোযোগী এবং অধৈর্য হোক না কেন, যদি কেউ এ অবস্থাতেও দোয়া করে যে, হে খোদা! মন তোমারই আয়ত্বে এবং নিয়ন্ত্রনে তুমি তাকে পরিষ্কার করে দাও। আর যখন মন অমনোযোগী থাকে তখন আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকে মনোযোগ চাওয়া হলে সেই অমনোযোগী অবস্থা থেকে খোদার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ মনের যে বন্ধ হওয়া অবস্থা তা খুলে যাবে এবং দোয়া করার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। এবং এটাই সে সময় যা কবুলিয়তে দোয়ার সময় বলা হয়। সে দেখবে এই সময় রূহ্ আল্লাহ্‌তাআলার আস্তানায় ভাসছে। এবং এক বিন্দু যা উপর থেকে নীচের দিকে পড়ছে।"

এক বর্ণনায় এসেছে যে, আঁ হযরত (সঃ) যখন কোন মজলিস থেকে উঠতেন তো তিনি দোয়া পড়তেন (এ বড় জামে দোয়া) হে আমার খোদা! তুমি আমাদের তোমার ভয় দান কর, আর তুমি আমাদের এবং পাপের মাঝখানে প্রতিবন্ধক বানিয়ে দাও যেন আমাদের মাধ্যমে তোমার নাফরমানী না হয়। এবং আমাদের আনুগত্যের মাকাম দান কর যার কারণে তুমি আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দিবে এবং এতটুকু বিশ্বাস দান কর যার মাধ্যমে দুনিয়ার বিপদ সহজ করে দাও। হে আমার খোদা! আমাদের কান, চোখ এবং নিজের শক্তির মাধ্যমে আজীবন সঠিকভাবে ফায়দা উঠানোর তৌফীক দান কর। এবং আমাদের কল্যাণের অংশীদার বানিয়ে দাও। যে আমাদের উপর যুলুম করে তুমি আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এবং যে আমাদের সাথে শত্রুতা করে তার বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। এবং দ্বীনে (ধর্মে) যে কোন রকমের পরীক্ষা থেকে বাঁচাও। এবং এমন কর যে, দুনিয়া আমাদের সবচেয়ে বেশি দুঃখ এবং চিন্তার কারণ না হয় এবং দুনিয়া পর্যন্তই যেন আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ না থাকে। এবং এমন ব্যক্তিকে আমাদের উপর নিযুক্ত করো না, যে আমাদের উপর রহম করে না এবং দয়ার আচরণ করে না। (তিরিমিযি কিতাবুদ্দাওয়াত বাব ফি জামেওদ্দাওয়াত)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ ফযলকে হাসিল করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে দোয়া। এবং দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে এর মধ্যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা এবং বেদনা থাকবে। যে দোয়া বিনয় ব্যাকুলতা এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে করা হয় তা খোদাতাআলার ফযলকে টেনে আনে এবং কবুল হয়ে আসল উদ্দেশ্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এটাও আল্লাহ্‌তাআলার ফযল ছাড়া হাসিল হয় না। এবং এর ঔষধ হচ্ছে দোয়া করে যাওয়া চাহে যেমনই অমনোযোগীতা এবং অনিচ্ছা থাকুক। কিন্তু মন না ভরুক। আসল এবং প্রকৃত দোয়ার জন্য দোয়ারই প্রয়োজন। অনেক লোক দোয়া করেন এবং তাদের মন ভরে যায়। এবং তারা বলে উঠে যে, কিছুই হয় না। কিন্তু আমার উপদেশ এটাই যে, এই ছাই হাতানোর মধ্যেও বরকত রয়েছে। অর্থাৎ মাটি ছাঁকার মধ্যেই বরকত রয়েছে। এমন চেষ্টা করাও বরকত। কেননা, পরিশেষে সকল উদ্দেশ্য তার কাছ থেকে বের হয়ে জিহ্বার সঙ্গে মিলে যায়। তারপর আপনাআপনি সেই বিনয় এবং ব্যাকুলতা যা দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় সৃষ্টি হয়ে যায়। যে রাতে উঠে এবং যতো অমনোযোগী এবং অধৈর্য হোক না কেন, যদি কেউ এ অবস্থাতেও দোয়া করে যে, হে খোদা! মন তোমারই আয়ত্বে এবং নিয়ন্ত্রনে তুমি তাকে পরিষ্কার করে দাও। আর যখন মন অমনোযোগী থাকে তখন আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকে মনোযোগ চাওয়া হলে সেই অমনোযোগী অবস্থা থেকে খোদার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ মনের যে বন্ধ হওয়া অবস্থা তা খুলে যাবে এবং দোয়া করার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। এবং এটাই সে সময় যা কবুলিয়তে দোয়ার সময় বলা হয়। সে দেখবে এই সময় রূহ্ আল্লাহ্‌তাআলার আস্তানায় ভাসছে। এবং এক বিন্দু যা উপর থেকে নীচের দিকে পড়ছে।" (আল-হাকাম ৭ম খন্ড ৩১ নবেম্বর ২৪ আগষ্ট ১৯০৩ইং পৃঃ ৩)

তারপর তিনি বলেনঃ সেই দোয়া যা মারেফাতের (তত্ত্বজ্ঞান) পরে এবং ফযলের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তা অন্য রং এবং অনুভুতির সৃষ্টি করে। সে বিলীন করার মতো জিনিস। সে হচ্ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সে রহমতকে টেনে আনার মতো এক চুম্বকীয়শক্তি। সে মৃত্যু পরিশেষে জীবন্ত করে থাকে। সে এক জলোচ্ছ্বাস পরিশেষে নৌকা তৈরী হয়ে যায়। প্রত্যেক অগোছালো কথা তার মাধ্যমে শুদ্ধ হয়ে যায়। এবং প্রত্যেক বিষ পরিশেষে তার মাধ্যমে অমৃত হয়ে যায়। মোবারক সেই কয়েদি যে দোয়া করার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। কেননা একদিন রেহাই পেয়ে যাবেন। মোবারক সেই অন্ধ যে দোয়াতে অলস নয় কেননা একদিন সে দেখতে পাবে। মোবারক সেই যে, কবরের মধ্যে পড়ে থেকে দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য চায় কেননা একদিন কবর থেকে বাহিরে বের করা হবে। মোবারক সেই যে, দোয়া করার সময় কখনও বিরক্ত হওনা এবং তোমাদের রূহ্ দোয়ার জন্য গলে যায় এবং তোমাদের চোখ অশ্রু ঝড়ায় এবং তোমাদের

বুকে এক আগুন সৃষ্টি করে দেয় এবং তোমাদের একাকীত্বের স্বাদ বুঝানোর উদ্দেশ্যে অন্ধকার কুটিরে এবং অনাবাদ জংগলে নিয়ে যায়। এবং তোমাদের অস্থির এবং দিওয়ানা এবং বেখেয়াল বানিয়ে দেয়। কেননা পরিশেষে তোমাদের উপর ফযল করা হবে। সেই খোদা যেদিকে আমি ডাকছি তিনি একেবারেই করীম, রহীম, সত্য, বিশ্বস্ত, দুর্বলদের উপর রহমকারী। সুতরাং তুমিও বিশ্বস্ত হয়ে যাও এবং পূর্ণ সততা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে দোয়া কর যেন তিনি তোমার উপর রহম করেন। দুনিয়ার শোরগোল থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং নফসানী ঝগড়াকে ধর্মের মধ্যে স্থান দিওনা। খোদার জন্য পরাজয় বরণ কর। এবং পরাজয়কে করে নাও যেন বড় বড় বিজয়ের তুমি অংশিদার হয়ে যাও।" ছোট ছোট দুনিয়াবী কথা এবং ঝগড়া থেকে বাঁচো, যা প্রত্যেহ প্রত্যেকের সঙ্গে লেগে থাকে। "দোয়াকারীকে খোদা মোযেযা দেখাবেন। এবং প্রার্থনাকারীকে এক অলৌকিক নেয়ামত দান করা হবে। দোয়া খোদার কাছ থেকেই আসে এবং খোদার কাছেই যায়। দোয়াতে খোদা এমন নিকটে হয়ে যান যে, যেমন তোমাদের প্রাণ তোমাদের নিকটে হয়ে থাকে। দোয়ার প্রথম নেয়ামত এটাই যে মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। তারপর সেই পরিবর্তনকে খোদা নিজের গুণে পরিবর্তন করে নেন। এবং তাঁর সিফত (গুণ)অপরিবর্তনীয় কিন্তু পরিবর্তনকারীর জন্য এর এক আলাদা বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। যাকে দুনিয়া জানতে পারে না। মনে হবে সে অন্য খোদা অথচ আর অন্য কোন খোদা নেই। কিন্তু নতুন বহিঃপ্রকাশে নতুন রঙে তাকে প্রকাশ করে থাকে। তখন এত বিশেষ বহিঃপ্রকাশের মর্যাদায় পরিবর্তনকারীর জন্য সে কাজ করে যা অন্যদের জন্য করে না এটাই সেই অলৌকিক অবস্থা।

তো যখন পরিবর্তন সৃষ্টি করো তখন খোদাতাআলাও নিজের অন্য শান দেখিয়ে থাকেন। বলা হয়েছে খোদা তো সেই যিনি পূর্বের খোদা। খোদা এখনও বদলান নি বরং তোমাদের পরিবর্তনের কারণে তোমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার বদলে যায়।

বলা হয়েছেঃ **"দোয়া সেই মহৌষধ যা এক মুষ্টি মাটিকে দামী করে দেয় এবং সে এক পানি যা ভেতরের ময়লাকে ধুঁয়ে দেয়। সেই দোয়ার সঙ্গে রূহ্ গলে যায় এবং পানির মতো ভেসে একত্ববাদের উপর পড়ে। সে খোদার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং রুকু করে, সেজদা করে, এবং তারই ছায়া হচ্ছে সেই নামায যা ইসলাম শিখিয়েছে।"** (লেকচার শিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড পৃঃ ২২২-২২৮)

পরিশেষে ফলাফল এটাই বের হলো যে, এসব দোয়া তখন দোয়ার রঙ ধারন করবে যখন তুমি নামাযের পাবন্দি করবে। কেননা নামাযের মধ্যে এসব কথা এসে যায়।

আল্লাহ্তাআলা করুন আমাদের সেই তত্ত্বজ্ঞান হাসিল হোক যা খোদার নৈকট্য লাভ করায়। আমাদের দোয়ার মধ্যে সেই অনুভুতির সৃষ্টি হোক যার মাধ্যমে আমাদে রুহ্ গলে গিয়ে আল্লাহ্তাআলার আস্থানায় ভেসে যায় এবং ভেসে যেতে থাকে। আমরা নিয়মিত নামায আদায়কারী হবো এবং আমাদের মসজিদ সর্বদা নামাযীদের দ্বারা ভরা থাকবে, যেভাবে আল্লাহ্তাআলার ফযলে এ দিনগুলোতে ভরা রয়েছে যেন আমরা সর্বদা আল্লাহ্তাআলার ভালবাসাকে আকর্ষণ করতে থাকি।

আমি এখন সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই যা গত জুমুআয় তাহ্রীক করেছিলাম। অর্থাৎ এখানকার মসজিদ বিষয়ে। হার্টলিপোল এবং ব্রেডফোর্ড এর মসজিদের জন্য ইউ কে জামাত-এর অঙ্গ সংগঠনগুলোকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্ আনসারুল্লাহ্ সর্বপ্রথম খবর পাঠিয়েছে যে তারা এত ওয়াদা একত্রিত করেছেন এবং শেষ রিপোর্ট গতকালকে পাঠিয়েছেন সে অনুযায়ী প্রায় তিন লক্ষ পর্যন্ত ওয়াদা রয়েছে। সর্বপ্রথম মজলিসে আনসারুল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওয়াদা আদায় করা হয়েছে। তারা কিছু আদায় করেছেন এবং তা বেশ ভাল সংখ্যায়। মাশাআল্লাহ্ । আলহামদুলিল্লাহ্ । আনসাররা এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন (বাকী সংগঠনকেও আমি বলছি) যে তাদের বৃদ্ধ মনে করবেন না। তারা যুবকদের যুবক। আমার ইচ্ছা ছিল যে জুমুআয় মনোযোগ আকর্ষণ করবো, কেননা গতকাল পর্যন্ত বাকী সংগঠনের পক্ষ থেকে কোন রিপোর্ট ছিল না, তো গত কালকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তারাও পাঁচ লক্ষের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু আনসারুল্লাহ্ যেভাবে বিস্তারিত ওয়াদা নেয়ার চেষ্টা করেছে সেভাবে নেয়া। সম্ভবতঃ তারা নিজেদের জন্য এক টার্গেট নির্ধারণ করে নিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে, আমরা ইনশাআল্লাহ্ এতো আদায় করবো। আল্লাহ্তাআলা সবাইকে পুরস্কার দিন। কিন্তু লাজনার পক্ষ থেকে এখনও কোন খবর আসেনি অথচ সর্বদা এই নিয়ম ছিল যে, লাজনা লাফ মেরে সামনে আসে। আমি এখান থেকে অফিসে গেছি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যে ওয়াদা আসে তার মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলাদের ওয়াদাই ছিল এবং মহিলারা ব্যক্তিগতভাবে নিজের অলংকার পেশ করেছিলেন। কিন্তু লাজনার সংগঠনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোন ওয়াদা আসেনি এজন্য তারাও যেন লাফ মারে এগিয়ে আসে কেননা আল্লাহ্তাআলার ফযলে লাজনা কখনোও মালী কুরবানীতে পিছিয়ে থাকে নি। আমি আশা করি এখনও থাকবে না। মনে হচ্ছে বেশি বিস্তারিত রিপোর্ট দেয়া উচিত ছিল যা তারা এখনও করে নি। আমি গত বারও বলেছিলাম যে মসজিদ ফযল হিন্দুস্থানের গরীব মহিলাদের চাঁদায় বানানো হয়েছিল। আর এখন তো আপনারা অনেক ভাল পজিশনে আছেন। আমার ধারনা যে, ইউ কে এর লাজনা আল্লাহ্তাআলার ফযলে এতো ভাল পজিশনে আছে যে, তারা যে কোন এক ভাল মসজিদের খরচ একাই করতে পারবে। আল্লাহ্তাআলা তাদের তৌফীক দিন। কিন্তু এতো অর্থ আসছে এ কথা শুনে বিশেষ করে আমি ব্রেডফোর্ডবাসীদের বলছি তারা যেন মনে না করে যে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেছে এজন্য রিলেক্স (Relex) হয়ে যাই। বরং নিজেরা জামাত, রিজিওন অথবা শহর অনুযায়ী যে চেষ্টা করা উচিৎ ছিল তারা যে আদায় নির্ধারণ করেছিলেন সে অনুযায়ী চেষ্টা জারি থাকা দরকার। যদি বেশি অর্থ এসে যায় তো ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ অন্য মসজিদে কাজে লাগবে। এখন ইনশাআল্লাহ্তাআলা মসজিদ তো বানাতে হবেই। একবার মসজিদ বনানোর কাজ শুরু করলে ইনশাআল্লাহ্তাআলা এটা জারি থাকবে। **আল্লাহ্তাআলা আমাদের তৌফীক দান করুন যে প্রত্যেক শহরে এখানে আমরা মসজিদ বানাবো। এবং এক সুন্দর মসজিদ তৈরী করি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) একবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, যদি ইউরোপে আমাদের আড়াই হাজার মসজিদ হয় তাহলে আমাদের উন্নতির গতি কয়েকগুণ বেশি হবে। তো আল্লাহ্ করুন জামাত শীঘ্র এমন তৌফীক যেন পায় আমরা এত সংখ্যায় এখানে মসজিদ বানাতে পারি।** রমযানে এসব লোককে স্মরণ রাখবেন যারা মসজিদের জন্য কুরবানী করেছেন এবং করছেন। আল্লাহ্তাআলা তাদের তৌফীকে বাড়াতে থাকুন।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন**

মুরব্বী সিলসিলাহ্, চট্টগ্রাম

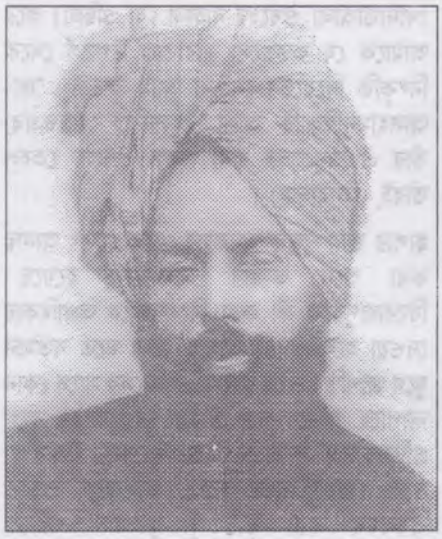

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্‌মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক– হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(তৃতীয় কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। চাকুরী থেকে আপনার ইস্তফা (-পদত্যাগ) গৃহীত হয় নি এটা অধমের অবিকল আকাঙ্খানুগ হয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ কোন উপলক্ষে উন্নতিও হয়ে যাবে। আশা করি, কুশলাদি সবসময় অবহিত করতে থাকবেন।

ওয়াসসালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
৭ জুলাই ১৮৮৬ইং

পত্র নং ৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্রের অন্তর্ধানে মর্মাহত ও ব্যথিত হলাম। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। অতি দয়ালু আল্লাহ্ আপানাকে যথাশীঘ্র উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম এবং যা চান করেন। মানুষের পক্ষে তার প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যু খুবই বড় ধরণের আঘাত তাই এর প্রতিদানও অনেক বড়। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে অতিসত্তর পরিতুষ্ট করুন, আমীন সুম্মা আমীন। 'সুরমা চাশমে আরিয়া' গ্রন্থটি আমার বার বার অসুস্থতার কারণে বিলম্বে ছেপেছে।এখন পাঁচদিন নাগাদ এর ভলিউমগুলো এখানে পৌছে যাবে। তখন অনতিবিলম্বে এক কপি আপনার খিদমতে পাঠানো হবে। যেহেতু এর পরেই 'সিরাজে মুনীর' পুস্তক ছাপা হবে এবং এর জন্য যে টাকা হাতে জমা ছিল তার সবটাই খরচ হয়ে গেছে। তাই জনাবও নিজ আশে-পাশে আন্তরিক মনোনিবেশে এর দাম নগদ পরিশোধকারী ক্রেতা সংগ্রহে প্রয়াসী হোন। এতে পাঁচশ' টাকার কাগজ ধার করে লাগানো হয়েছে। শিমলার একাউনটেন্ট মুন্সী আব্দুল হক সাহেব এই পাঁচশ' টাকা ঋণ দিয়েছেন। আরও চারশ' টাকা ছিল যা এতে খরচ হয়েছে। এ উপলক্ষটি অত্যন্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার দাবী রাখে, যাতে 'সিরাজে মুনীর' পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব না ঘটে। 'সুরমা চাশ্‌ম' পুস্তকটির দাম হচ্ছে এক টাকা বার আনা। আপনার প্রচেষ্টায় যদি এর একশ' কপি বিক্রি হয়ে যায়, তবু তা আপনার জন্য (আল্লাহ্‌র কাজে) সাহায্যের এক প্রাপ্য হক সাব্যস্ত হয়ে যাবে।'ওয়া মাই ইয়ানসুরিল্লাহা ইয়ানসুরহু [আর যে আল্লাহ্‌র (কাজে) সাহায্য করে , তাকে তিনি সাহায্য করে থাকেন–অনুবাদক।] আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনার ওপর রহমতের বারি বর্ষণ করুন এবং নিজ বিশেষ তৌফীক (সুযোগ-সামর্থ্য) দানে এমন সব কাজ করান যাতে তিনি রাজী (সন্তুষ্ট) হয়ে যান। 'ওয়ালা তাওফীকা ইল্লা বিল্লাহ্ (তৌফীক কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই লাভ হয়ে থাকে - অনুবাদক)। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ (আফা আনহু)
২০ সেপ্টেম্বর ১৮/৮৬ইং

পত্র নং ৮

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত প্রিয় ভ্রতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আজ পঞ্চাশ টাকার একটি নোট জনাবের পক্ষ থেকে মিঞা করীম বখ্‌শ সাহেব শিয়ালকোট থেকে পাঠিয়েছেন। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা'। যেহেতু 'সিরাজে মুনীর' পুস্তকটির প্রকাশে এখন আর বেশি দেরি হবে বলে মনে হয় না। তবে এর খরচপাতি বাবদ পুঁজির জন্য টাকার অনেক প্রয়োজন হবে, সেহেতু আ'লী জনাব যদি এর অবশিষ্ট পঞ্চাশ কপির দাম পাঠিয়ে দেন, তাহলে পুস্তকটির প্রকাশে তা প্রয়োজনীয় পুঁজি বাবদ যথাসময়ে কাজে আসতে পারে। আমি মুন্সী আব্দুল হক সাহেব একাউনটেন্টের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম এবং আরো তিনশ' টাকা আমার কাছে ছিল। এর সবটাই এ পুস্তক ('সুরমা চাশমে আরিয়া') প্রকাশে খরচ হয়েছে। তা ছাড়া এর একশ' কপি বিনামূল্যে হিন্দু, আরিয়া ও খ্রীষ্টানদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। যদিও এর দাম এক টাকা বার আনা রাখা হয়েছে, কিন্তু এর (প্রকাশ বাবদ) খরচ বেশি হয়ে যাওয়াতে মূল্যবাবদ এ অঙ্ক কম মাত্রায় দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ কি, প্রায় সকল মুসলমানেরই ধর্মের প্রতি খেয়াল সম্পূর্ণ উঠে গেছে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সুধারণা পোষণ- উত্তম এসব গুণই দৈনন্দিন হ্রাস পাচ্ছে। 'ওয়াল্লাহু খাইরুও ওয়া আবকা' (–আর আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন যিনি সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী–অনুবাদক)।

খোদা-ই জানেন আপনার সাথে কবে সাক্ষাৎ হবে। প্রত্যেক বিষয়ই সে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ওয়াস্‌সালাম]

বিনীত,
গোলাম আহমদ
আম্বলা সদর, ৪ নভেম্বর ১৮৮৬ ইং

মন্তব্য ঃ এ চিঠিটিতে যে পুস্তকের দাম বাবদ হযরত হাকীমুল উম্মত (খলীফা আওওয়াল)-কে স্মরণ করানো হয়েছে তা হলো 'সুরমা চাশমে আরিয়া'। এ চিঠিতে প্রকাশ পায় যে, এ পুস্তকটির একশ' কপি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তখন পর্যন্ত বিনা মূল্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। (ইরফানী)

পত্র নং ৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রখানা পেলাম। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে দুনিয়াতে এবং দীনে হৃদয় জুড়ানো আরাম ও প্রশান্তি দান করুন, প্রতিটি দান-প্রতিদান যে কেবল তাঁরই অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। 'নযর বর্ ফযল'-(অর্থাৎ ঐশী কৃপায় দৃষ্টি রাখা) এ যে এক সুস্বাদু ও স্বস্তিদায়ক বিষয়। 'ওয়া লা তাইয়াসু মির রওহিল্লাহে' (-আর ঐশী কৃপা সম্পর্কে তোমরা কখনও নিরাশ হবে না-অনুবাদক)। জনাবের প্রণীত পুস্তক যা (ছাপার জন্য) অমৃতসর পাঠানো হয়েছে, এর জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো সে বিষয়ে কিছু জানা গেল না। আজকাল সততার অভাব। মৌখিক জমা-খরচ ও বাগাড়ম্বর কখনও আস্থাযোগ্য নয়। লিখিত শর্তাবলী ছাড়া কাউকে পুস্তক (ছাপতে) দেয়া উচিত নয়, যাতে পরে কোনো খারাপ পরিণতি দেখা না দেয়। মুদ্রণালয়ের মালিকের সাথে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করে নেয়া উচিত।

প্রথম, অমুক (নির্দিষ্ট) নমুনা মোতাবেক ছাপার কাজ পরিষ্কার এবং উত্তম হবে।

দ্বিতীয়, যদি ওরূপ পরিষ্কার না হয় তাহলে ফর্মা প্রতি চার আনা করে (কাটা)-এর অধিকার থাকবে।

তৃতীয়, এত মাসের মধ্যে যদি কাজ সম্পন্ন না হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

চতুর্থ, পুস্তকের সমস্ত কপি হস্তান্তর করার পর এবং সেগুলোর শুদ্ধতা যাচাই করার পর পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়া হবে।

পঞ্চম, কাগজের মান উত্তম হওয়ার জন্য মুদ্রণালয়ের মালিক দায়বদ্ধ থাকবেন।

যে ওষুধটিতে মারওয়ারিদ অন্তর্ভুক্ত যার কিছু পরিমাণ আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন, এর ব্যবহারে আমার বেশ উপকার হয়েছে। দৈহিক শক্তির এক অদ্ভুদ উপকার হয় এ ঔষধে এবং এটি পাকস্থলিকেও শক্তিশালী করে, আর ক্লান্তি ও আলস্যকে দূর করে। বিভিন্ন আরও ক'টি উপসর্গে এটি উপকারী। আপনি অবশ্যই এটি ব্যবহার করে আমাকে অবহিত করুন। আমার তো এটি খুবই উপযোগী হয়েছে (Suit করেছে)। 'ফা-আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিক'।

বিনীত

গোলাম আহমদ

৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৬ইং

পত্র নং ১০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব, (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। আমার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগছে যে, উল্লেখিত ওষুধটি থেকে জনাব কোন উপকার বোধ করেননি। হয়ত এক্ষেত্রে সে উক্তিটিই যথার্থ বলে প্রযোজ্য যে,ঔষধাবলী মানবদেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যধর্মী হয়ে থাকে। কোন ঔষধ কারো ক্ষেত্রে উপযোগী হয়। আবার অন্য কারো ক্ষেত্রে উপযোগী হয় না। আমার ক্ষেত্রে এ ঔষধটি খুবই উপকারী বলে মনে হয়েছে। কয়েকটি উপসর্গ যেমন ক্লান্তি ও আলস্য এবং পাকস্থলির জলীয় পদার্থসমূহ দূরীভূত হয়েছে। আমার এক অতি ভয়াবহ রোগ ছিল হয়ত শরীরের মৌল উত্তাপের অভাব এর কারণ ছিল। সে উপসর্গটি সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, এ ঔষধটি শরীরের মৌল উত্তাপের জন্যও উপকারী। মোট কথা, আমি তো এর দ্বারা যথেষ্ট ফল পেয়েছি। 'ওয়াল্লাহু আ'লাম ওয়া ইলমুহু আহ্‌কাম' (-আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে বেশি জানেন এবং তাঁর জ্ঞানই সবচেয়ে যথার্থ ও অনড়-অটল-অনুবাদক)। যদি ওষুধটি মওজুদ থাকে এবং আপনি দুধ ও মালাইয়ের সাথে কিছু বেশি পরিমাণে মিশিয়ে ব্যবহার করেন তাহলে আমি আপনার শরীরের এসব উপকার সংক্রান্ত সুসংবাদ শোনবার জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখি। কখনও কখনও ওষুধের লুকিয়ে থাকা ক্রিয়াও থাকে যা ৭/১০ দিন পর অনুভব হয়। যেহেতু ওষুধও শেষ হয়ে গেছে এবং বেশি বেশি খেয়ে ফেলেছি, তাই আমি আল্লাহ্‌তাআলা যদি চান, সে ঔষুধটি পুনরায় তৈরী করার ইচ্ছা রাখি। কিন্তু আমি পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছিলাম, আমার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে কিছু ধারণা রয়েছে। এ যাবৎ সে ধারণা পুক্তো হচ্ছে। খোদাতাআলা বাস্তবে তা সত্য সাব্যস্ত করুন। এ দিক থেকে আমি শীঘ্র ঔষধ তৈরির মোটেও প্রয়োজন দেখছি না কিন্তু খোদাতাআলা ঔষধের বাহানা (বা ওছিলা) করে আমাকে যে কতগুলো মারাত্মক উপসর্গ থেকে নিস্কৃতি দিয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। 'ফা-আলহামদুলিল্লাহি আলা ইহ্‌সানিহি' (অতএব, তাঁর এ অনুগ্রহের জন্য সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই -অনুবাদক)।

ছাপার জন্য পুস্তক অমৃতসর থেকে ফেরৎ আনার কথা শুনে আমার আফসোস হয়েছে। ফিরোজপুরকে কী জন্য বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো? বরং আমার জানা মতে বর্তমান যুগে জাগতিকভাবে অভিজ্ঞ লোকদের সাথে কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কারণ তারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গে দুঃসাহসী হয়ে থাকেন। উত্তম ও সরল সোজা নিয়ম হচ্ছে, আইনানুগ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলাও বলেন, 'যখন তোমরা পরস্পর লেন-দেন কর তখন সে ব্যাপারটি লিপিবদ্ধভাবে সম্পাদন করা উচিত।' ছাপাখানা এমন হওয়া উচিত যেখানে প্রেসম্যানরা পারদর্শী হয় এবং উত্তম ও সর্বোচ্চমানের কালি ব্যবহার করা হয়। আর এ যাবতীয় শর্ত স্ট্যাম্পের কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যথাসম্ভব মুদ্রাকরদের প্রথমেই যেন টাকা দেয়া না হয়। কাগজ যেন তাদের দায়িত্বে কেনা হয়। কিন্তু কাগজ নিজের এবং 'কাতেব'ও নিজের হতে হবে। আমার জানা মতে ইমামউদ্দীন কাতেব হিসাবে তুলনামূলকভাবে ভাল। প্রুফ নিজেই দেখা উচিত। অমৃতসরে এক হিন্দুর ছাপাখানাও আছে। সে একজন বিত্তশালী এবং উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে নেবে বলে আশা করি। শর্তাবলীর পরিষ্কারভাবে নিষ্পত্তি এবং লিখিত অঙ্গীকারনামা ছাড়া কখনও কোনো মুদ্রণালয়ে কাজ দেওয়া উচিত নয়। কারণ আজকাল সততা ও প্রতিজ্ঞা পালন সদগুণগুলো হারিয়ে যাওয়া বস্তুর ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি অমৃতসর যাই, আর একদিনের জন্য আপনিও আসেন, তাহলে সেখানেই চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আপনি বর্তমান কালের মুসলমানদের প্রতি আস্থা রেখে কাঁচা কাজ কখনও করবেন না। বরং প্রত্যেক ব্যাপারে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নিন। পুস্তকাদি ছাপাতে তিন কি চার শ' টাকার খরচ আছে। এতো মিতব্যয়িতাও করা উচিত নয় যে তাতে পুস্তকাদি রদী দ্রব্যের ন্যায় ছাপা হয়। আর এমন অপব্যয়ও করা উচিত নয়, যাতে বাহুল্য খরচ হয়। প্রুফ দেখার কাজ অন্যদের হাতে কখনও ছেড়ে দেবেন না, নিজে পরিশ্রম স্বীকার করুন। কাগজ কেনায়ও নিজের কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সঙ্গে থাকা উচিত এবং কাগজের হিসাব রাখা উচিত। আপনার সাক্ষাতের জন্য

খুবই মনে চায়। আল্লাহ্‌জাল্লাশানুহু শীঘ্র এর কোন উপলক্ষ সৃষ্টি করে দিন।

ওয়াস্‌সালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ, কাদিয়ান

১৪ রবিউসসানী ১৩০৪ হিঃ (১৯ জানুয়ারী ১৮৮৭ ইং)

পত্র নং ১১

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব, (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেলাম। এ অধমের অভিমত এটাই, আপনি যেন চাকুরী না ছাড়েন। তারা আপনাকে যা দিচ্ছে, যদি তার চে'ও বেতন কম হয় তবু আপনি গ্রহণ করুন। আর সবার সাথে আখলাক (সদ্ব্যবহার) এবং সহিষ্ণুতার সাথে আচরণ করুন। মু'মিনের জন্য এটাই বাধ্যকর, তারা যেন পরামর্শ ছাড়া তড়িঘড়ি কোন কাজ করে না বসেন। অতএব, আমি আপনাকে এ পরামর্শই দিচ্ছি, (চাকুরী থেকে) আলাদা হবার পথ অবলম্বন করবেন না। আপনি ইস্তফা কেন দিলেন এতে আমি দুঃখিত হয়েছি অথচ আপনি লিখেছিলেন যে, এই আলাদা হবার ক্ষেত্রে আপনার কোন হাত নেই। যাহোক আপনি অবশ্যই নিজের চাকুরীতে বহাল থাকার সংকল্পের লক্ষ্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। ওয়াস্‌সালাম, নে'মাল্ মাওলা ও নে'মাল্ ওয়াকীল (তিনি কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম কার্যনির্বাহক-অনুবাদক)

বিনীত,

গোলাম আহমদ, কাদিয়ান

নোট ঃ এ চিঠির উপর কোন তারিখ লেখা নেই। কিন্তু নিশ্চিত ধারণা এই যে, এটি ১৮৮৭ সালেরই চিঠি। (ইরফানী)

পত্র নং ১২

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব, (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

ওয়াল্লাহু মাআকুম আইনামা কুনতুম (-আর আপনি যেখানেই থাকুন, আল্লাহ্ আপনার সাথে হোন-অনুবাদক)। 'সুরমা চাশ্‌মে আরিয়া' গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠায় 'কাতেব' (ছাপার জন্য কপি লেখক)-এর ত্রুটিজনিত ভুল হয়েছে। অর্থাৎ ১৩ লাইনের শেষ দিকে 'কো' -এর স্থলে 'সে' লিখা হয়েছে এবং ১৪ লাইনের শুরুতে 'সে' শব্দের পরিবর্তে 'কো' লিখা হয়েছে। আর ১৭ লাইনের শেষ দিকে 'উস্‌কা' শব্দ বাদ পড়েছে, অর্থাৎ 'জরুরিয়া মুতলাকা সে'-এর পরিবর্তে 'জরুরিয়া মুতলাকা উসসে' হওয়া উচিত ছিল।

মোটকথা, উল্লেখিত 'কো', 'সে' এবং 'উস' এই তিনটি শব্দ ভুলের কারণে বাক্যটি গোলমেলে হয়ে গেছে। যেমন, বাক্যের পূর্বাপর ইঙ্গিতে এ ভুলগুলো আপনা আপনি ধরা যায়।এ ধরনের ভুল ঘটনাক্রমে কোথাও কোথাও থেকে যায়। মানবীয় দুর্বলতা। সম্ভবত কপি রাইটার বা অন্যকোন কাতেব কর্তৃক এরকম ভুল সংঘটিত হয়েছে কিন্তু এ অধম জনাবের লেখা পোস্টকার্ডে তা পড়ে বেশি অবাক হয়েছে। জনাব আরও লিখেছেন, "হযরত (অর্থাৎ এ অধম) 'কাযিয়া জরুরিয়া মুতলাকা'-কে 'দায়েমা মুতলাকা'-এর চেয়ে 'আখাস্' লিখেছেন। কাতেবের ভুলের দরুন এর বিপরীত লিখা হয়েছে। সেজন্য বাক্যটি বুঝা গেল না। বস্তুত ন্যায় শাস্ত্রবিদদের বক্তব্য এটাইঃ (আরবী বাক্যাবলী)"

মূল পোস্টকার্ডটি (এতদসঙ্গে ফেরৎ) পাঠানো হলো। এতে যদি কোন ভুল থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক অবগত করবেন। কেননা অন্যদিকে গভীর মনোনিবেশের কারণে আমার এসব বিদ্যায় এখন আর তেমন চর্চা ও ব্যুৎপত্তি নেই।

আলস্যের চিকিৎসা ঃ আলস্য ও দুঃখবোধ যদি শারীরিক উপসর্গ ও কারণ বিশেষ হয়ে থাকে তাহলে তো আপনি নিজে এর চিকিৎসা ও নিরাময়-ব্যবস্থা আমার চেয়ে ভাল জানেন। আর যদি তা রূহানী (আধ্যাত্মিক) কারণে হয়ে থাকে, তাহলে এর চেয়ে উত্তম আর কোন চিকিৎসা নেই যেমনটি আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেনঃ "ইন্নাল্লাযিনা কালূ রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাস্তাকামূ তাতানাযযালু আলাইহিমুল মালায়িকাতু আল্লা তাখাফু ওয়ালা তাহ্‌যানূ ওয়া আবশিরু বিল্‌জান্নাতিল্লাতি কুনতুম তূয়াদূন নাহনু আওলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদদুনিয়া ওয়াল আখিরাতে ওয়া লাকুম ফিহা মা তাশ্‌তাহী আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন, নুযুলাম মিন গাফূরির রাহীম।" অর্থাৎ "নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক' অতঃপর তারা অবিচল থাকে তাদের ওপর ফিরিশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয় (এবং বলে) তোমরা ভীত ও দুঃখিত হবে না। আমরা পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও তোমাদের বন্ধু এবং তোমাদের মনে যা চাইবে সেখানে তা তোমাদের জন্য (পরিবেশন করা) হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য তা-ও থাকবে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে এটা হচ্ছে অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকরী (আল্লাহ্)-এর পক্ষ থেকে আতিথ্য"-অনুবাদক)।

অতএব খোদাতাআলাকে অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করা এবং এর পর অত্যাবশ্যকীয় পরীক্ষাগুলোতে বিচলিত না হওয়া এবং সকল অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ থাকা এটাই ভয় ও দুঃখবোধের চিকিৎসা। যেমন বলা হয়েছেঃ

'হুকমে জানাঁ চুনেস্‌ত জখম মদোয।
জাঁ আগার বসোয দত গো বসোয ॥

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

পুণঃ আপনার সাক্ষাত লাভের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষী। স্বভূমে যাবার যদি সুযোগ ঘটে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে দেখা করে যাবেন।

সংকলকের মন্তব্যঃ

এ চিঠির ওপরও কোন তারিখ লেখা নাই। কিন্তু 'সুরমা চাশ্‌মে আরিয়া' পুস্তকে কোন কোন ছাপার ভুল সংক্রান্ত উল্লেখে প্রতীয়মান হয়, এ পত্রটি গ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তী সময়ের এবং নিশ্চয় ১৮৮৭ সালের। এ পত্রটি পাঠে কয়েকটি বিষয়ের দিকে আলোকপাত হয়। প্রথমত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় পরম বিনয় ও পবিত্রচিত্ততা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ)-এর স্বভাবে হযরতের (আঃ) প্রতি চরম পর্যায়ের আদব ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।একটি জ্ঞানগত বিষয় জানার জন্য তিনি যে পোস্টকার্ডটি লিখেছিলেন তা ফেরৎ নিয়ে নিলেন, পাছে তা আদব ও শিষ্টাচার বিরোধী হয় এবং এতে আপত্তি উত্থাপন জাতীয় কিছু পরিলক্ষিত হয় আর এটাই এক অশুভ স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবে। তৃতীয়ত, এ পত্রটি থেকে এ-ও জানা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)সেই সময়ে আল্লাহ্‌র দিকে সম্পূর্ণ নিবিষ্টচিত্ত ও আত্মবিভোর ছিলেন এবং খোদাতাআলার পথে প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্টকে অতি স্বাচ্ছন্দে ও পরম আনন্দচিত্তে বরদাস্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আর সেজন্যই প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ও আলস্যের অবস্থান পেরিয়ে জান্নাতে ছিলেন। (ইরফানী)

অনুবাদ- **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ?

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

[তৃতীয় কিস্তি]

কিন্তু, আফসোস যে, এই অবস্থাটা সেই বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য হয় না, যারা যুদ্ধ করার বিলাসিতায় অযথা লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের একমাত্র উপায় থাকে, তাদের যা কিছু আছে তা সবই বিক্রি করে দেওয়া এবং এমনকি, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর কাছে যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করার শর্তে বন্দোবস্ত করে তাদের ভবিষ্যতকে পর্যন্ত বন্ধ রেখে দেওয়া। এটা করা ছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ, তা যদি হয় দীর্ঘায়িত ও ধ্বংসাত্মক কোন যুদ্ধ, যেমনটা হয়ে গেল ইরাক ও ইরানের মধ্যে। **এই দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে যুলুম ও নির্যাতন চালিয়েছে বা চালায় তার দায়িত্ব সেই সকল দেশের স্কন্ধেও, খানিকটা হলেও বর্তায়, যারা তাদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে।**

সব কথা বলাই যখন শেষ হবে, যখন সব কিছুই করা হয়ে যাবে, দেনাপাওনা মিটমাট হবে, এবং জিনিষপত্রের লেনদেনেরও হিসাবাদি হয়ে যাবে, তখন একটা প্রশ্নের বিবেচনা করাটা, সম্ভবতঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে যে, আখেরে এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের সুবিধাভোগী বা বেনিফিশিয়ারী কে বা কারা?

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের নিন্দা করা হচ্ছে বর্বর ধর্ম বলেঃ বলা হচ্ছে যে, এই ধর্ম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে, ঘৃণা এবং অসহিষ্ণুতার প্রচার করে, এবং নিজের অনুসারীদেরকে এমনভাবে ভাগ ভাগ করে ফেলে যে, তারা একে অপরের রক্তপিপাসু শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। এটা কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। কারণ, এথেকে তারা একটা প্রান্তিক সুবিধাও পেয়ে যায়, তাদের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত কার্যকর করবার এবং ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র শস্ত্রের জোগান দেওয়ার এই মুসলিম উম্মাহ্‌র হতভাগ্য যুদ্ধরত দলগুলোর কাছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' কথাটা থেকে আর একটা মজার কথা উদ্ভাবিত হয়েছে, এবং তা গত দশকে চয়ন করেছে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো, কথাটা হচ্ছেঃ 'ইসলামিক আণবিক বোমা'। বলা হয় যে, পাকিস্তান এই বোমার অধিকারী। অবশ্য, 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' বলতে যদি কোন কিছু থেকে থাকে, তাহলে 'ইসলামিক আণবিক বোমা' থাকাও তো দরকার। এটাও বিচিত্র কিছু নয় যে, বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের জন্য উপযোগী বিভিন্ন কথাও (টার্ম) অতঃপর, যোগ করে দেওয়া হবে 'ইসলামিক' শব্দটির সাথে। কিন্তু, আমরা কি এমনটা কখনও শুনেছি যে, খৃষ্টান আণবিক বোমা, ইহুদী আণবিক বোমা, হিন্দু আণবিক বোমা, বর্ণবৈষম্য বোমা কিংবা শিন্টো বোমা? তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে,

আরও হাজারো রকমের 'ধর্মীয়' বোমা বলার জায়গা থাকলেও, পাশ্চাত্য গণমাধ্যমগুলো, বিশেষভাবে সনাক্ত এবং তিরস্কার করার জন্য, বাছাই করে নিয়েছে একটা ইসলামিক বোমাকেই- যে বোমার অস্তিত্বই কিনা সন্দেহজনক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আসল যে শক্তিগুলো কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর কোনটারই চরিত্র কোনভাবেই মূলতঃ ধর্মীয় নয়। তাহলে, অধুনা যখনই কোন মুসলিম দলে উপদলে বা দেশের কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হতে দেখা যায়, তখনই কেন সেটাকে 'ইসলামিক' বলে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়? যে শক্তিগুলো সারাক্ষণ অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করে ইরাক-ইরান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করেছিল, যার দরুন ধন-সম্পদের অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছে, অগণিত মানুষের প্রাণ নাশ হয়েছে, মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়েছে, তার দায়িত্ব কি তারা এড়াতে পারে? তাদের আড়ালের উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, তাদের কাজ-কর্মের দ্বারা কেবল খোমেনিইজমকেই টিকে থাকতে সাহায্য করা হবে। যুদ্ধরত দেশগুলোকে যদি তাদের নিজেদের সামর্থ্যের উপরেই দেওয়া হতো, তাহলে খোমেনিইজম তখনই পতনের দিকে ধাবিত হতো।

সৌদীদের ধর্মীয় দর্শনের উৎপত্তি 'ওহাবীজম' বা 'ওয়াহ্হাবী মতবাদ' থেকে। এই মতবাদ তার প্রেরণা লাভ করেছে ইসলামের মধ্য যুগের অসহিষ্ণু বিশ্ব থেকে। এই মতবাদ হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর যামানার অধিকতর সমঝোতা স্থাপনকারী ও উদার ইসলাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেনি। এই সৌদী প্রভাব বিস্তারকে সহায়তা দান করেছে সৌদী পেট্রো ডলার, এবং বিশ্বব্যাপী বড় বড় সব ব্যাংকে গচ্ছিত বিপুল বিপুল আয়তনের সৌদি ব্যালান্স সমূহ। সৌদী আরবের জমার ঘরে গচ্ছিত এই সমস্ত বিশাল পরিমাণের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুদের একটা হিস্যা ব্যবহৃত হয়, সৌদী অ্যারাবিয়ান ধন-ভান্ডারসমূহ থেকে, এইড বা সাহায্যের চ্যানেল তৈরীর কাজে এবং তা প্রবাহিত হয়ে যায় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বা মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে। এই যে সাহায্য তা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দেওয়া হয় না; বরং তা দেওয়া হয় মসজিদ নির্মাণে, এবং সৌদী ব্রান্ডের উলামা তৈরীর উদ্দেশ্যে স্কুল, মাদ্রাসা ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

অন্য সব কিছুর মধ্যে, এই যুদ্ধ ইরানীদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান ঘটিয়েছিল এবং তা শক্তিশালীও করেছিল, যা কিনা ইরানীদের দৃষ্টিকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাদির উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা বহিঃশত্রুর হুমকীর প্রতি নিবদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ না ঘটলে, খোমেনিইজমের মাত্রাতিরিক্ত অসহিষ্ণুতা ও কট্টর সংস্কার থেকে ইরানীদের মোহমুক্তি ঘটতে পারতো আরও বেশি দ্রুততার সঙ্গে। ইরানের অভ্যন্তরে বিপ্লবের মূল্যবোধগুলির যথার্থতা নিরূপণ করার এবং তার ভাল ও মন্দের বিচার করার একটা বড় অংশকেই উৎখাত করা হয়েছে, তবু যে বুদ্ধিজীবীরা টিকে গেছেন তাঁরা খোমেনিয়ান বিপ্লবের লাভ-লোকসানের হিসাবটা আর একবার না কষেই পারেন না। ইরানের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থার সন্ধান করাটা এখন, বলা যায়, আসন্ন হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ চলাকালে, যুদ্ধজনিত উত্তেজনা ইরানী জনসাধারণের নৈতিক বল চাঙ্গা রাখতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ইরানের এই নৈতিক বল যখনই শেষ হয়ে যাবে তখনই তা হবে তার জন্য এক মহা অনিশ্চয়তার সময়। বর্তমান সরকারকে যদি কোন বামপন্থী বা ডানপন্থী কিংবা মধ্যপন্থীদের কোন বামঘেঁসা দল অপসারিত করতে পারে, তাহলে প্রাধান্য বিস্তার এবং সরকার গঠনের জন্য একটা বড় ধরনের লড়াই বেঁধে যাবে। অতএব, সব কিছুই আবার সেই জ্বলন্ত কড়ায়েই পতিত হবে, এবং কেউ আর তখন নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, ইরানের কপালে কী আছে! আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি ইরানের জনগণের জন্য শুধু এতটুকুই প্রার্থনা করতে পারি যে, তাদের কঠিন সময়ের পরে যেন একটা শান্তির ও সুখের সময় আসে। তারা অবশ্যই একটা সাহসী জাতি, ভাগ্যবান জাতি। অতীতে তারা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছে এবং এখনও পোহাচ্ছে ইরানী, অ-ইরানী উভয়েরই হাতে। এবং পরিহাস যে, চুক্তির ব্যাপারে তারা এক প্রকার বদনামও অর্জন করেছে। আল্লাহ্ তাদের উপর রহম করুন! তাদেরকে এই নিদারুণ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ দান করুন!

এখন আমরা ইরানে খোমেনিয়ান বিপ্লবের আর একটা দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই। ক্ষমতায় আসার পর পরেই, আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী শুধু ইরানী মুসলমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি বা লাইফ-ষ্টাইলকে বিদেশীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত করবারই পরিকল্পনা করলেন না, তিনি বরং, একই ধরণের বিপ্লব পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও সংঘটিত করবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রচার করে দিলেন যে, তিনি ফিলিস্তীনিদেরকে সহায়তার ক্ষেত্রে এবং জাইঅ্যানবাদী শক্তিকে পরাজিত করার ব্যাপারে আরও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবেন। স্পষ্টতঃই, না কোন মুসলিম রাষ্ট্র, না ইসরাঈল, কোন ইরানী দূতকে আগ বাড়িয়ে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং বিপ্লবকে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালান করা সম্ভব হয়নি। ইরান তার পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে তার বিপ্লবের মাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সন্দেহ নেই, সে কিছুটা কামিয়াবী হাসিল করেছে ফিলিস্তীনি-ইসরাঈলী সেক্টরে। **আমি ইতোপূর্বে বলে এসেছি যে, এই এলাকাটিতে যে সকল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তা সে ইসরাঈলের বিরুদ্ধেই হোক, আর পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেই হোক, তার লাইসেন্স তারা ইসলামের কাছ থেকে পায় নি, পেয়েছে একমাত্র ইরানি বিপ্লবের দর্শন থেকেই।**

যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও শক্তি প্রয়োগের যে সব লম্বা লম্বা কথাবার্তা আমরা শুনে থাকি, তা সবই –এই উদ্ভট অবস্থাটার গুরুত্ব বুঝাবার আগে - সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সংকীর্ণ এবং অসহিষ্ণু মনোভাব ইদানিং প্রায় সব মুসলিম দেশের মোল্লাগোষ্ঠীর কাছে ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর দায়িত্ব প্রধানতঃ বর্তায় সৌদি আরবের স্কন্দে। সৌদি আরব সারা মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিও বিস্তার করতে চাচ্ছে ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে। এ ব্যাপারে তার একটা বিশেষ একক সুবিধাও আছে; কেননা সে ইসলামের পবিত্রতম দুটি শহর মক্কা ও মদিনার হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং, এই সুযোগটিকে সে নিশ্চিতভাবেই তার পক্ষে কাজে লাগাবে, যথাসাধ্য।

সৌদীদের ধর্মীয় দর্শনের উৎপত্তি 'ওহাবীজম' বা 'ওয়াহ্হাবী মতবাদ' থেকে। এই মতবাদ তার প্রেরণা লাভ করেছে ইসলামের মধ্য যুগের অসহিষ্ণু বিশ্ব থেকে। এই মতবাদ হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর যামানার অধিকতর সমঝোতা স্থাপনকারী ও

উদার ইসলাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেনি। এই সৌদী প্রভাব বিস্তারকে সহায়তা দান করেছে সৌদী পেট্রো ডলার, এবং বিশ্বব্যাপী বড় বড় সব ব্যাংকে গচ্ছিত বিপুল বিপুল আয়তনের সৌদি ব্যালান্স সমূহ। সৌদী আরবের জমার ঘরে গচ্ছিত এই সমস্ত বিশাল পরিমাণের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুদের একটা হিস্যা ব্যবহৃত হয়, সৌদী অ্যারাবিয়ান ধন-ভান্ডারসমূহ থেকে, এইড বা সাহায্যের চ্যানেল তৈরীর কাজে এবং তা প্রবাহিত হয়ে যায় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বা মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে । এই যে সাহায্য তা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দেওয়া হয় না; বরং তা দেওয়া হয় মসজিদ নির্মাণে, এবং সৌদী ব্রান্ডের উলামা তৈরীর উদ্দেশ্যে স্কুল, মাদ্রাসা ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

অতএব, যেখানেই আপনি সৌদী সাহায্যের প্রবাহকে অনুসরণ করবেন, সেখানেই আপনি দেখতে পাবেন যে, মোল্লা-মৌলবীদের সংকীর্ণ অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্দেহ নেই, যখন খৃষ্টান জগৎ শোনে যে দিনরাত উচ্চ কণ্ঠে সমস্ত অ-মুসলিম মূল্যবোধকে নিন্দাবাদ করা হচ্ছে, এবং অ-মুসলিম সরকারগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদের (ধর্মযুদ্ধের) ডাক দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, জেহাদের এই সব হাঁক-ডাক, অবশেষে, রীতিমত যুদ্ধে না পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু, বাস্তবে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

মুসলিম 'ক্লার্জি' (Clergy) বা মোল্লা-মৌলবীরা বা আলেম-উলামা অন্য কথায় 'মোল্লাগোষ্ঠী' জেহাদের কথা এবং অন-ইসলামিক শক্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলার কথা খুব জোরে শোরেই বলে থাকেন। আসলে অন-ইসলামিক শক্তি বলতে তাঁরা যা বুঝাতে চান তা, না-খৃষ্টান, না ইহুদী, না বৌদ্ধ, না নাস্তিক। তাঁদের মতে, সকল মুসলিম ফের্কা বা দল, কেবল তাদের নিজেদের ফের্কা বা দল ছাড়া, হয় চারিত্রিকভাবে অমুসলিম, নয়তো এমন সব মতবাদের অনুসারী যার দরুন তারা খোদার এবং খোদার সাধু বান্দাদের গযবে বা ক্রোধে পতিত হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত দুষমন, তাদের হিসেবে, কোনও অ-মুসলিম নয়, বরং এই শত্রুরা হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের ইসলামেরই ভিতরের কিছু কিছু ফের্কা বা দল উপদল। মুসলমানদের সেই যুদ্ধংদেহী প্রবণতাকে কোন অ-মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত করার চাইতে অনেক অনেক বেশি করে কাজে লাগানো হচ্ছে এক ফের্কার মুসলমানের দ্বারা আর এক ফের্কার মুসলমানের বিরুদ্ধে। আর এজন্যই তারা ধর্মত্যাগী বা মুরতাদদের জন্য মৃত্যুদন্ডের শাস্তির উপরে এত বেশি জোর দেয়। এটাই হচ্ছে তাদের অস্ত্র, যা তারা প্রয়োগ করতে চায় সেই সমস্ত ফের্কার মুসলমানের বিরুদ্ধে যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ফের্কার সঙ্গে মতবাদ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। এই ফের্কাগুলোকে মৃত্যুর আঘাত হানা হয় দুই ধাপে। প্রথম, তাদের মতবাদকে ঘোষণা করা হয় অন-ইসলামিক বলে ; যার ফলে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা মুরতাদ-ধর্মত্যাগী। দ্বিতীয়তঃ, ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের শাস্তি যেহেতু, তাদের মতে, মৃত্যুদন্ড : সেহেতু তারা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হওয়ার যোগ্য।

যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক এ ব্যাপারে এক মত হবেন যে, এই ক্রমবর্ধমান যুদ্ধংদেহী প্রবণতা খোদ মুসলমানদের মধ্যেই বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে, এবং এটাই এক ফের্কার অনুসারীদের মনে আর এক ফের্কার অনুসারীদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

মুসলিম 'ক্লার্জি' (Clergy) বা মোল্লা-মৌলবীরা বা আলেম-উলামা অন্য কথায় 'মোল্লাগোষ্ঠী' জেহাদের কথা এবং অন-ইসলামিক শক্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলার কথা খুব জোরে শোরেই বলে থাকেন। আসলে অন-ইসলামিক শক্তি বলতে তাঁরা যা বুঝাতে চান তা, না-খৃষ্টান, না ইহুদী, না বৌদ্ধ, না নাস্তিক। তাঁদের মতে, সকল মুসলিম ফের্কা বা দল, কেবল তাদের নিজেদের ফের্কা বা দল ছাড়া, হয় চারিত্রিকভাবে অমুসলিম, নয়তো এমন সব মতবাদের অনুসারী যার দরুন তারা খোদার এবং খোদার সাধু বান্দাদের গযবে বা ক্রোধে পতিত হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত দুষমন, তাদের হিসেবে, কোনও অ-মুসলিম নয়, বরং এই শত্রুরা হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের ইসলামেরই ভিতরের কিছু কিছু ফের্কা বা দল উপদল।

এ বিষয়ে অমুসলিম শক্তিগুলো সম্পর্কে যতটা বলা যায়, তা হচ্ছে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারে এবং একেবারে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বের এই তথাকথিত যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনভাবেই কোন আশঙ্কা নেই। এর একটা বাস্তব প্রমাণস্বরূপ যে কেউ পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদী আরবের সম্পর্কটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এটা বিশ্বাস করাই অসম্ভব যে, সৌদী অথবা তার প্রভাবাধীন দেশগুলো ইউএসএ অথবা তার কোন মিত্র দেশের বিরুদ্ধে তরবারি উঠাবার কখনও স্বপ্ন দেখে।

সৌদী শাসন নিজের টিকে থাকার জন্য ইউ. এস. এ-র উপরে শতকরা একশ'ভাগই নির্ভরশীল । এই শাসক-পরিবারটির প্রায় সাকল্য সম্পদই গচ্ছিত রাখা হয়েছে আমেরিকার ও পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলোতে। সর্বোপরি তাদের ভিতরের এবং বাইরের নিরাপত্তার জন্য পাশ্চাত্যের উপর তাদের নির্ভরশীলতার ব্যাপারটা এত বেশি প্রকট যে, তা আর নতুন করে বলারই অপেক্ষা রাখে না। মাত্র এ দুটো বিষয়ই এ ব্যাপারে গ্যারান্টি যে, না সৌদী আরব না তার প্রভাবাধীন কোন মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিম পাশ্চাত্যের জন্য কখনো কোন হুমকির সৃষ্টি করতে পারবে। তদুপরি, এটা তো জানা কথাই যে কোন একটা মুসলিম রাষ্ট্রও বর্তমানে এমন নেই যে, সে তার যুদ্ধ-সামগ্রী উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণমূলক প্রয়োজনে তারা সবাই নির্ভশীল হয় প্রতীচ্যের উপর, নয়তো প্রাচ্যের উপরে। এবং এটাই তো যে কোন গ্যারিন্টির চাইতে অনেক বেশি যে, তারা অমুসলিম শক্তিগুলোর সঙ্গে নিরাপদ ও শান্তি পূর্ণ আচরণ করতে বাধ্য। একই কথা লিবিয়া এবং সিরিয়ার মত দেশগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য, এরাও পাশ্চাত্যের সঙ্গে ততটা না হলেও প্রাচ্যের শক্তিগুলোর সঙ্গে অনুরূপ সৌহার্দমূলক সম্পর্কই বজায় রেখে চলে। *(চলবে)*

(পুস্তক-আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা)

অনুবাদ-শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত

(কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থানসমূহ)

(৫ম কিস্তি)

মসজিদে আকসার বৈশিষ্ট্যাবলী

মসজিদে আকসার অনেক বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি হলো, এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম নামায আদায় করতেন। বিশেষভাবে মসজিদে মোবারক নির্মিত হওয়ার পূর্বে তো তিনি (আঃ) এই মসজিদে নামায আদায় করেছেন এবং জিক্‌রে ইলাহীতে নিমগ্ন থাকতেন। এই মসজিদের প্রাচীন অংশের মধ্যবর্তী মেহরাবে হুযূর আলাইহিস সালাম ১৯০০ সালের ১১ই এপ্রিল ঈদুল আয্‌হা উপলক্ষ্যে আরবী ভাষায় ঈদের উপস্থিত (প্রস্তুতিহীন) খুতবা প্রদান করেন, যা 'খুতবায়ে ইলহামীয়া' নামে অভিহিত।

মসজিদে আকসাতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বরকতমন্ডিত যুগে ১৮৯১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭৫ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন। হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে ১৮৯২ সালের সালানা জলসা ব্যতীত (যা খালের তীরে অনুষ্ঠিত হয়) বাকী সকল জলসা মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল রাযীআল্লাহুতাআলা আন্‌হুর মোবারক যুগেও প্রথম দিকের পাঁচটি জলসা মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়।

মীনারাতুল মসীহ্

মসজিদে আকসা এই গর্ব ও সম্মানও লাভ করেছে যে, সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম "মীনারাতুল মসীহ্" নির্মাণের জন্য এই মসজিদের আঙ্গিনাকে নির্বাচন করেন। ১৯০৩ সালের ১৩ই মার্চ রোজ শুক্রবার এই মসজিদের আঙ্গিনায় মীনারাতুল মসীহ্‌র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বরকতমন্ডিত সময়ে এর নির্মাণ কাজ শেষ করা যায়নি। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী রাযীআল্লাহুতাআলা আনহু তাঁর খেলাফতের প্রথম বছরেই ১৯১৪ সালের ২৭শে নভেম্বর মীনারাতুল মসীহের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজে নিজের মোবারক হাতে ইট রেখে এর নির্মাণ কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালের ১৬ইং ফেব্রুয়ারীতে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এই মনোহর ও চিত্তাকর্ষক মিনারের উচ্চতা ১০৫ ফুট। এই মীনারে রয়েছে ৩টি তালা এবং উপরে রয়েছে গম্বুজ। এতে ৯২টি সিড়ির ধাপ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা অনুযায়ী মীনারের উপর সেই সকল নিষ্ঠাবান চাঁদাদাতাগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যারা একশত টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। সেই যুগে কেবল নির্মাণ কাজেই ৫,৯৬৩ টাকা ব্যয় হয়েছিল। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম মীনারাতুল মসীহের নির্মাণের সময় যে সকল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে তিনটি উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। মোয়াজ্জেন এই মীনারে চড়ে দিনে পাঁচবার আযান দিবেন যাতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ধ্বনি প্রত্যেক মানুষের কানে পৌছে যায়।

২। এই মীনারে একটি বাতি সংযুক্ত করতে হবে। যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, স্বর্গীয় জ্যোতির যুগ এসে গেছে।

৩। এই মীনারে একটি বড় ঘড়ি সংস্থাপন করতে হবে যাতে মানুষ তাদের নিজেদের সময় চিনতে পারে এবং যাতে তারা সময়কে সনাক্ত করার ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং যাতে মানুষ একথাও বুঝে নেয়, আকাশের দরজা খোলার সময় এসে গেছে।

আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে ও দয়ায় এই মীনারের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এটি এর নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করে চলেছে এবং ইন্‌শাআল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ করতে থাকবে।

বেহেশ্‌তী মাকবেরা

কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহের মাঝে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো, বেহেশ্‌তী মাকবেরা। এখানে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের পবিত্র দেহকে ১৯০৮ সালের ২৭শে মে, সন্ধ্যা ছয়টার সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে পবিত্র মাটিতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আর এটাই হলো সেই কবর, যার মাটিকে হুযূর (আঃ) কে কাশ্‌ফে রূপালী দেখানো হয়েছিল। হুযূর (আঃ) তাঁর পুস্তক

আল্-ওসীয়্যত-এ' এ বিষয় উল্লেখ করেছেন। এটাই হলো সেই বেহেশ্‌তী মাকবেরা, যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা হুযূর (আঃ) কে এই সু-সংবাদ দিয়েছিলেন, এটা জামাতের সেই সকল সম্মানিত লোকগণের কবর যারা বেহেশ্‌তী।

প্রত্যেক আহমদীর এই আকাংখা ও হৃদয়ে এই আবেগ থাকে সে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের মাযারে দোয়া করতে পারে এবং অধিকাংশ নবদিক্ষীত আহমদী এই প্রশ্ন করে থাকেন, তারা কী দোয়া করবেন। তাদের অবগতির জন্যই লিখছি, নিয়ম-নীতি অনুযায়ী দোয়ার জন্য হাত উঠাবেন এবং সর্বপ্রথম সূরা ফাতেহা ও দুরূদ শরীফ পড়বেন। এরপর নিজ ভাষায় নিম্নবর্ণিত দোয়া সমূহ করবেন।

সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ার লোকদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলেন, তোমাদের মাঝে যে-ই "মসীহ্ মাওউদ" পাবে সে যেন তাঁকে আমার সালাম পৌছায়। (দূররে মনসুর, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭৪৩)।

হে আল্লাহ্ ! আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের কবরে দাঁড়িয়েছি। আমার পক্ষ থেকে সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাম তাঁর কাছে পৌছে দাও। হে আল্লাহ্! ইসলাম কে জীবন দানের জন্য তিনি যে জামাতের (আহমদীয়ত) ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং কুরআন মজীদ ও হাদীসের যে শিক্ষা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা বেশি থেকে আরো বেশি লোককে গ্রহণ করার সামর্থ্য দান কর। আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে এবং জামাতের সকল ব্যক্তিকে এসকল শিক্ষার উপর আমল করার সামর্থ্য দান কর। হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে যুগ-খলীফার সেরূপ আনুগত্য করার সামর্থ্য দাও যেরূপ আনুগত্য হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আনহু হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের করেছিলেন। আমাদের বর্তমান ইমাম আইয়াদাল্লাহুতাআলাকে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে, সাহায্য ও সহায়তা দান করতে থাক। হে আমাদের প্রভু! এই কবরস্থানে শায়িত সকল মৃসীর প্রতি এবং সারা বিশ্বের মৃসীগণের প্রতি তোমার করুণা ও দয়া অবতীর্ণ কর এবং আমাদেরকেও এই কল্যাণমন্ডিত নেযামে (ওসীয়্যত) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সামর্থ্য দাও। এরপর নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষমার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়েও আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে দোয়া করা যেতে পারে। (আল্লাহ্‌তাআলা সকলের দোয়া কবুল করুন)। আমীন।

বেহেশ্‌তী মাকবেরার বেষ্টনীতে বিদ্যমান পবিত্র স্থানসমূহ

বেহেশ্‌তী মাকবেরার বেষ্টনীর বর্তমান আয়াতন প্রায় ১৭ একর। এটা সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পিতৃপুরুষের বাগান ছিল। পরবর্তীতে আরো কিছু জমি ক্রয় করে এই বেষ্টনীকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বেহেশ্‌তী মাকবেরায় সর্বপ্রথম হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আনহুকে সমাহিত করা হয়। মৌলভী সাহেব ১৯০৫ সালের ১১ই অক্টোবর যোহরের নামাযের পর কাদিয়ানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর (রাঃ) নামাযে জানাযা পড়ান। পূর্ব দিকের খালের জনবসতিতে অবস্থিত সাধারণ কবরস্থানে তাঁকে (রাঃ) আমানত স্বরূপ দাফন করা হযেছিল। ২৬শে ডিসেম্বর নামাযে যোহর ও আসরের পর তাঁর (রাঃ) কাফনের বাক্স কবর থেকে বের করা হয় এবং পুনরায় ২৭শে ডিসেম্বর সকাল প্রায় দশটার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাহিস সালাতু ওয়াস সালাম একটি বড় সমাবেশে তাঁর (রাঃ) নামাযে জানাযা আদায় করেন এবং পুনরায় তাঁকে (রাঃ) বেহেশ্‌তী মাকবেরায় দাফন করা হয়। বেহেশ্‌তী মাকবেরায় তাঁর (রাঃ) কবরই সর্ব প্রথম কবর। (সূত্রঃ হায়াতে তাইয়্যেবা, পৃষ্ঠা ২৯৭)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ১৯০৮ সালের ২৬শে মে লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। ২৭শে মে তাঁকে (আঃ) বেহেশ্‌তী মাকবেরায় সমাহিত করা হয়। তাঁর (আঃ) ডান দিকে (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে) হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আনহুর কবর এবং বাম দিকের (পূর্ব দিকের) স্থান খালি রয়েছে। হযরত উম্মুল মু'মেনীন সৈয়্যদা নূসরত জাহাঁ বেগম সাহেবা রাযীআল্লাহুতাআলা আনহার দাফনের জন্য এ স্থানটি খালি রাখা হয়েছে। হযরত উম্মুল মু'মেনীন রাযীআআল্লাহুতাআলা আনহা ১৯৫২ সালের ২০/২১ এপ্রিলের মধ্যবর্তী রাতে রাবওয়ায় মৃত্যু বরণ করেন। তিনি (রাঃ) আমানত স্বরুপ বেহেশ্‌তী মাকবেরায় সমাহিত রয়েছেন। তাঁর(রাঃ) ওসীয়্যত ছিল, **"আমাকে কাদিয়ানে পৌছাতে হবে, এখানে যেন রেখে দেয়া না হয়।"**

(তারিখে আহমদীয়াত, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা-১১৫)।

জামাতের বন্ধুগণের সর্বদা দোয়া করা উচিত যেন সেদিন শীঘ্র আসে যখন মরহুমার ওসীয়্যত অনুযায়ী জামাত এই আমানতকে তাঁর ওসীয়্যতকৃত স্থানে সমাহিত করার সামর্থ্য লাভ করে।

আহমদীয়া জামাতের উন্নতির সাথে সাথে এর বিরোধিতা বেড়ে যাওয়াও এক আবশ্যকীয় বিষয় ছিল এবং এখনো তা-ই। এর ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে কখনো প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। হতে পারে কোন কোন নির্বোধ বিরুদ্ধবাদী কবরসমূহকে অসম্মান করার চেষ্টা করবে। বস্তুতঃ ১৯২৫ সালের নভেম্বরে হুযূর আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য আরো কোন সাহাবী রেজওয়ানুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য কোন কোন কবরের চার পাশে প্রাচীর তৈরী করা হলো। অন্য দিকে কোন কোন স্বল্প তরবিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং অ-আহমদী বন্ধুগণ যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের কবরে ফুল না দেয় এবং শিরকজাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন না করে

সে জন্য তাদেরকে এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যও চারদিকে প্রাচীর তৈরী করা আবশ্যকীয় মনে করা হয়েছিল।

১৯৫৬/৫৭ সালে বেহেশ্‌তী মাকবেরার বিস্তৃত এলাকার চারপাশেও পাকা প্রাচীর তৈরী করা হয়। এই প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে সম্মানিত দরবেশগণ 'ওয়াকারে আমলের (সেচ্ছাশ্রমের) মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

মকানে হযরত আম্মাজান রাযীয়াল্লাহুতালা আন্‌হা

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র কবরস্থান থেকে যখন আমরা পশ্চিম দিকে যাব তখন সম্মুখে একটি ঘর দেখতে পাওয়া যাবে। এই ঘরকে 'মাকানে হযরত আম্মাজান (রাঃ)' বলা হয়। একে 'দারুল ওয়াকেফীনও বলা হয়। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র মরদেহ লাহোর থেকে কাদিয়ানে এনে ১৯০৮ সালের ২৭শে মে এই ঘরের মধ্যবর্তী কামরায় রাখা হয়েছিল। আর এই কক্ষে বন্ধুগণ তাদের নেতাকে শেষ বারের মত দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক কক্ষকেও দেখা যেতে পারে।

নোট ঃ এই পুস্তিকার বিনীত লেখক মুহাম্মদ হামীদ কাওসার উল্লেখ করছি, এই ঘরের উত্তর-পূর্ব কোনায় একটি গোসলা-খানা ছিল। এর টাংকিতে পানি ঢালার রাস্তা বাইরের দিক থেকে তৈরী করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালের ঘটনা। খাকসার দেখলাম হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রাঃ) পাকিস্তান থেকে আগত কোন কোন অতিথিকে বলছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সময় একবার খুব ভোরে আমি দেখলাম হুযূর (আঃ) কূঁয়া থেকে "বুকেতে" (রবার বা চামড়ার বালতিতে) পানি এনে এই টাংকিতে ঢালছিলেন। ভাইজী (রাঃ) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি সেই "বুকে" হুযূর আলাইহিস সালামের হাত থেকে নিয়ে নিলাম এবং এরপর আমি পানি এনে ঢাললাম। এত ভোরে হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর কোন সেবককে পানি আনার কষ্ট দিতে চাননি।

বসার জায়গা

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন তাঁর নিজ বাগানে সাহাবা কেরামগণের সাথে আসতেন তখন এই উঁচু ছাদে আসতেন এবং সাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মজলিসের অনুষ্ঠান করতেন। আর এর সাথে সাথে ঋতু অনুযায়ী উপস্থিত সাহাবীগণকে তাজা ফল দিয়ে আপ্যায়নও করতেন। ১৯৭২ সালে এই জায়গায় একটি পাকা কক্ষ নির্মাণ করে দেয়া হয় এবং হুযূরের বসার জায়গাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়। এই কক্ষটিও দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হয়েছে।

জানাযা গাহ্

এই বাগানে সেই স্মরণীয় এবং পবিত্র স্থানও রয়েছে যেখানে জামাতের বন্ধুগণ ১৯০৮ সালের ২৭শে মে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল রাযিআল্লাহুতাআলা আনহুর পিছনে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নামাযে জানাযা আদায় করেন। দুটো 'সরু' বৃক্ষের (ইউক্যালিপটাস জাতীয় বৃক্ষের) মাঝে আজও এ জায়গা দেখা যেতে পারে।

কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল

জানাযা গাহের নিকটেই সেই স্থানটিও অবস্থিত, যেখানে জামাতের বন্ধুগণ ১৩২৬ হিজরীর ২৫শে রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৯০৮ সালের ২৭শে মে মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আন্‌হুকে সর্বসম্মতিক্রমে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রথম খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) স্বীকার করে নিয়ে তাঁর হাতে বয়াত করেছিলেন। আর একেই কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল বলা হয়। (কুদরতে উলা' শব্দটি নবুওয়তের জন্য এবং 'কুদরতে সানীয়া খেলাফতের জন্য ব্যবহার করা হয়)। অর্থাৎ আহমদীয়া জামাতে খেলাফতের শুরু এই স্থান থেকেই হয়েছিল, যা ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। তারিখে আহমদীয়াত, তৃতীয় খন্ডের ৫৬২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই প্রথম বয়াত বাগানের কোন অংশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এবং আরো কোন কোন মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবা যেমন মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেব, নাযের তালীম, রাবওয়া, মাস্টার ফকীর উল্লাহ্ সাহেব, অফিসার, আমানত, রাবওয়ার রায় অনুযায়ী প্রথম বয়াত হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বাগানে হয়েছিল, যা বাগানের দক্ষিণ অংশে বেহেশ্‌তী মাকবেরা সংলগ্ন। স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী রাযীআল্লাহুতাআলা আনহুর ধারনাও মোটামুটি এটাই ছিল। এর বিপরীত বিশেষভাবে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রাঃ) এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বাগানকে প্রথম বয়াতের স্থান বলে নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করতেন। জনাব মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব নামক এক সাহাবীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম বয়াত উভয় স্থানেই হয়েছে। প্রথমে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বাগানে এবং পরে হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রাঃ) এর বাগানে হয়েছে।

(চলবে)

মুহাম্মদ হামীদ কাওসার

অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

মৃত্যুঞ্জয়ী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী

(পঞ্চম ও শেষ কিস্তি)

তিনি বিশ্বব্যাপী আহমদীয়তের প্রচার ও প্রসারের উপর সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাছাড়া বহু আহমদী বন্ধুর সাথে তাঁর অনেক কথোপকথন হয়। তাঁর বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। আইন শাস্ত্রে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট হওয়াটা ছিল তাঁর কাছে আহমদীয়তের সত্যতার এক মোযেযার (নিদর্শন)। রহমান ও রহীম খোদার দোয়া কবুলিয়তের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর স্নেহভাজন অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবকে বলেন-

আমি তখন মুসলিম হলের ছাত্র। 'ল'(Law)-তে ভর্তি হয়েছি। ল' এর ছাত্ররা কি পরিমাণ লেখা পড়া করে তা আপনারা সবাই বুঝেন। আমারও অবস্থা এর ব্যতিক্রম ছিল না।" পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে Reading Room এর পত্র পত্রিকা নিয়েই সময় কাটাতাম বেশি। Reading Room-এ নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা থাকতো। আহমদীয়তের কোন কোন পত্রিকা পুস্তিকাও থাকতো। সেগুলোও আর দশটা কাগজের মতই পড়তাম আমি। অনেক কথার মধ্যে একটা কথা আমার মনে বেশ আবেদন সৃষ্টি করলো। মির্যা সাহেব [মসীহ্ মাওউদ (আঃ)] দাবী করেছেন, খোদা কথা বলেন, প্রার্থণা কবুল করেন। খোদা সর্ব শক্তিমান সর্বজ্ঞ। আমার মনে কৌতুহলের সৃষ্টি হলো। তাই যদি হয়, তা'হলে আমি আর লেখা পড়া করবো না; দেখি খোদা আমাকে পাশ করান কী করে।

"বাস্তবিক বলতে কি, আমার অন্য সব সহপাঠিরা যখন বসে বসে লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে; তখন আমি হলের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ি আর দোয়া করি, হে খোদা! তুমি যদি সত্য হও, মির্যা সাহেবের দাবী যদি সত্য হয়; তবে তুমি আমাকে জ্ঞান দান কর- তোমার সর্বজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ দাও, মির্যা সাহেবের দাবী সত্য কি না, এর প্রমাণ দাও। দিনের পর দিন এভাবে নামায পড়তে থাকলাম এবং দোয়া করতে থাকলাম। পরীক্ষা এলো। মনে যা এলো লিখে দিয়ে এলাম খাতায়। যথা সময়ে ফল বেরুলো। পাঁচ জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। তাদের মধ্যে দেখলাম আমারও নাম। অবাক হলাম, আশ্চর্য হলাম।

"কিন্তু বয়াত করলাম না, যদিও উচিত ছিল। সংশয়ের সৃষ্টি হলো মনে। একি দোয়ারই ফল? একি মির্যা সাহেবের সত্যতার প্রমাণ? না আমার সামান্য জানার ফল? হয়তো বা কিছুটা অহমিকারও সৃষ্টি হয়েছিলো মনে। ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম।

আমার মন স্থির করলাম। আবারও দোয়ায় রত হলাম। দেখি ফাইনাল পর্বে কি হয়। লেখা পড়া বাদ তো দিলামই, শুধু পার্সেন্টেজ (উপস্থিতি) ঠিক রাখার জন্য যে ক্লাসে যেতাম তাও কমিয়ে ফেললাম। প্রক্সিরও ব্যবস্থা হলো কিছুটা। দিন কাটতে লাগল। পরিশেষে পরীক্ষা এলো। আমার জন্য পরীক্ষার পরীক্ষা। পরীক্ষা দিলাম। সময় মত রেজাল্ট বেরুলো। এবারে একজন মাত্র ছাত্রই প্রথম শ্রেণী পেয়েছে এবং বলা বাহুল্য সে আমিই। আমার মনে হলো ঘটনাটা যে, accidental কিছু নয়, Co-incidental ও নয়; পক্ষান্তরে এ যে দোয়ার ফল, এ যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার প্রমাণ- সে কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খোদাতাআলা যেন দেখিয়ে দিলেন যে, 'দেখ, আবদুর রহমান! প্রথম শ্রেণী পাওয়ার যোগ্যতা আরও অনেকের ছিল কিন্তু তোমার সন্দেহ নিরসনের জন্য শুধু তোমাকেই দেওয়া হলো।' মনে হলো আমার অর্বাচীনতার জন্যই আমার বন্ধুদেরকে বঞ্চিত রাখলেন খোদাতাআলা। মনটা বড্ড ভারী হয়ে উঠেছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এবং দোয়া কবুলিয়তের আশ্চর্য নিদর্শন পরিস্ফুটিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেই আহমদীয়তের প্রতি আবেগাপ্লুত হই। (পাক্ষিক আহমদী ৩১ জুলাই ১৯৭২)। খোদাতাআলার রহমত প্রাপ্তির অনুরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে।

ঢাকায় বিভিন্নজনের সাথে দেয়া সাক্ষাতের পর তিনি রাবওয়া চলে যান। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশে ১৬ অক্টোবর ১৯৬৯ তারিখ পুনরায় রাবওয়া থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন (পাক্ষিক আহমদী ৩০ অক্টোবর'১৯৬৯)। তখন আমেরিকায় তিনি মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে অধীনস্থ মিশনারীদের নিয়ে জামাতে আহমদীয়ার প্রচার ও প্রসারের কাজে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন। একদিকে প্রতিষ্ঠিত জামাতগুলিকে সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় চাঙ্গা করেন, অপরদিকে বড় বড় তবলীগি কর্মসূচীতে আমেরিকার বুকে সাড়া জাগিয়ে তোলেন। একদা তিনি ডেটনের প্রাথমিক লূথেরন গির্জায় একটি এবং স্থানীয় স্কুলে দু'টি সভায় ইসলামের শিক্ষার উপর সারগর্ভ ও প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। পরে তিনি ক্লীভল্যান্ডের মেয়রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ঐশী শান্তির সুসংবাদ জানান এবং জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন পুস্তক উপহার দেন। এতে মেয়র সাহেব অভিভূত হন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বঙ্গবীর খাঁ সাহেবকে ক্লীভল্যান্ড নগরীর চাবি উপহার দেন। তখন এ সংবাদটি দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনটি হল ঃ

আমেরিকায় ইসলাম প্রচার

আমেরিকায় নিয়োজিত মোবাল্লেগ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব এক পত্রে সকল আহমদী ভ্রাতাকে সালাম জানিয়েছেন ও তাঁর তবলীগ প্রচেষ্টায় সফলতার জন্য দোয়ার অনুরোধ করেন। ইসলামের পয়গাম নিয়ে তিনি ক্লিভল্যান্ডের মেয়রের সাথে সাক্ষাৎ করলে মেয়র তাঁকে KEY OF CITY OF CLEAVE LAND উপহার প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও ইসলামের পয়গাম পৌছান। আল্লাহ্তাআলার ফযলে তাঁর তবলীগের ফলে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে দশজন ও মার্চ মাসে নয় জন বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত

হয়েছেন। বন্ধুগণ, নতুন ভ্রাতাদের ঈমানের মজবুতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খাসভাবে দোয়া করবেন (পাক্ষিক আহমদী ১৫ এপ্রিল, ১৯৭০)। উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রথম মিশনারী হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) ইসলামের শান্তির বাণী অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমেরিকার দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছিলো। অনুরূপ বাঙ্গালির গর্বের ধন আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব ক্লিভল্যান্ড মহানগরীর চাবী উপহার প্রাপ্ত হন। এসব ঘটনা আমেরিকায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বাংলার এ কিংবদন্তী তুল্য মানুষ খাঁ সাহেব অভিভাবক হিসেবে ছিলেন এক সফল পুরুষ। দুই বছরের মাতৃহারা সন্তান সালাহউদ্দিন সাহেবকে নিজের তত্ত্বাবধানে আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। ১৯৪২ সালে কাদিয়ান যাওয়ার পর এ ধর্মপ্রাণ সুবোধ বালককে ইসলামের খেদমতে হুযূর সানী (রাঃ)-এর নিকট উৎসর্গ করেন। ফলে পিতার মত অত্যন্ত মেধাবী সুযোগ্য সন্তান জামেয়া আহমদীয়ায় অধ্যয়ন করে উত্তম মোবাল্লেগ হন। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে দীর্ঘ দিন হল্যান্ডের রাজধানী হেগে জামাতে আহমদীয়ার মিশনারী ছিলেন। পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির জামাতের মোবাল্লেগ হিসেবে কাজ করেন। খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে কামাল উদ্দিন খাঁ সাহেব এম এ পাশ করার পর পিতার আদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষকতায় কাজ করেন। তিনি দারুল খেলাফতের নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে আফ্রিকার ঘানায় জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সেকেন্ডারী স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে দীর্ঘ দিন দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। অতঃপর অন্যান্য দেশে ইসলামের খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তৃতীয় ছেলে জামালউদ্দিন খাঁ সাহেব হল্যান্ডে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর বিদেশ ভূমিতে কর্মরত আছেন। খাঁ সাহেবের প্রথম মেয়ের জামাতা হল্যান্ডের অধিবাসী সে দেশের ন্যাশনাল আমীর বিশিষ্ট বুযূর্গ মোহতরম্ হিবাতুর নূর সাহেব। দ্বিতীয় মেয়ের জামাতা ইন্দোনেশিয়ার সাবেক মোবাল্লেগের ছেলে নাবিদ সুমাত্রী সাহেব। খাঁ সাহেবের অন্যান্য ছেলে মেয়েরাও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ধর্মের সেবায় আত্মনিবেদিত। সাহাবীর বংশোদ্ভূত তাঁর সহধর্মীণি অত্যন্ত পরহেজগার মহিলা। তিনি শত বছর বয়সে জীবিত আছেন এবং বর্তমানে বড় মেয়ের সাথে হল্যান্ডে বসবাস করছেন। এ আর খাঁ বাঙ্গালী ও তাঁর অর্ধাঙ্গীণি প্রকৃত পক্ষেই সফল ও সার্থক আর্দশ জনক জননী।

ইসলামী পরিভাষায় নফ্সকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজের পবিত্রতা ও উৎকর্ষ লাভ এবং অপরকে উদ্বুদ্ধ করাই উত্তম জেহাদ। আর এ জেহাদের একজন সার্থক ও সফল বীর সেনানী আমাদের আব্দুর রহমান খাঁ। কেননা, বাল্যকাল থেকেই পবিত্র জীবনযাপনের মাধ্যমে যৌবনে ইমামুজ্জামানের দীক্ষা গ্রহণে নিজকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে স্কুলের শিক্ষকতা এবং সূদূর আমেরিকায় অবক্ষয়ের প্লাবনে ভেসে যাওয়া মানুষের নফসকে পবিত্র করার সংগ্রামে আমরণ জেহাদ করেছেন। ফলে অসংখ্য মানুষের কলুষিত নফস পবিত্র আত্মায় রূপান্তরিত হয়। আর এ জেহাদের রনাঙ্গনেই বীর বাঙ্গালী ১৬মে, ১৯৭২ সালে ৬৯ বছর বয়সে আমেরিকার ডেটন প্রচার কেন্দ্রে আপন মাওলার ডাকে পরপারে পাড়ি দেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নফসের জেহাদের রনাঙ্গনে শহীদ হন। হার্ট এ্যাটাকে তাঁর জীবনাবসান হয়। সেদিন রাতেই তাঁর সহকর্মী মাওলানা চৌধুরী শুকুর এলাহী হোসাইন সাহেব টেলিফোনে রাবওয়ায় তা হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)-কে জানান। হুযূর (রাহেঃ) তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি শুনে তাঁকে ধর্ম যুদ্ধে একজন শাহাদত বরণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। উল্লেখ্য, খাঁ সাহেবের পূর্বে প্রথম ১৯৪৮ সালে আমেরিকায় তবলীগের জেহাদে কর্তব্যরত অবস্থায় মাওলানা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব পিতা হযরত মির্যা মোহাম্মদ শফি দেহলভী (রাঃ) শাহাদতের পিয়ালা পানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন (দৈনিক আল ফযল ১৯ মে ১৯৭২)।

খাঁ সাহেবের মরদেহ জামাতের ব্যবস্থাপনায় রাবওয়ায় আনা হয়। হুযূর (রাহেঃ) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান এবং রাবওয়ার বেহেশতী মাকবেরায় মোবাল্লেগদের জন্য সংরক্ষিত খাস বেষ্টনীতে তাঁকে চির শায়িত করা হয়। বাংলাদেশী বুযুর্গ ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব এ মহান ব্যক্তির নামাযে জানাযায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর কতবায় (স্মৃতিফলক) লেখা আছে শহীদ আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী। তাঁর মৃত্যুতে ৪ জুন, ১৯৭২ তারিখ, ঢাকার দারুত তবলীগে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা তাঁর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তাঁর বাল্যবন্ধু এডভোকেট গোলাম ছামদানী খাদেম স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আব্দুর রহমান আর আমি একই সাথে লেখাপড়া করি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইন ব্যবসা করি। সে আইন পেশা ছেড়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন হুযূর সানী (রাঃ)-এর কাছে। আর আমি থেকে গেলাম আইন নিয়ে। সে ইসলামের খেদমতে ইতিহাস সৃষ্টি করলো। আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় হিসাব নিকাশ করে দেখি সে-ই জয়ী হল। তাঁর জীবন সফল হয়েছে। হায়রে! আমিও যদি যেতাম-নিজকে সোপর্দ করতাম খলীফার কাছে, তাহলে আমার জীবনটাও তাঁর মত সার্থক হতো। সেদিন হারানো বন্ধুর প্রতি গভীর শোকে তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠে। সভায় তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

আহমদীয়তের আকাশের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র বাহ্যিকভাবে চলে গেলেও তাঁর কীর্তি অমর হয়ে আছে। তাঁর আলোকবর্তি কীর্তিমান জীবনালেখ্য আমেরিকায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে অম্লান হয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস পারের বাঙ্গালী তবলীগের জেহাদে মরেও অমর। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না বরং তাঁরা তাদের প্রভুর সান্নিধানে জীবিত এবং তাদেরকে রিযক দেয়া হচ্ছে (আল ইমরান ৩; ১৭০। অনাগত দিনে আহমদীয়তের বিশ্ব বিজয়ের প্রবহমান ধারায় 'এ আর খাঁ বাঙ্গালী' নামটি উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হয়ে উঠবে। প্রকৃত পক্ষে তিনি মরেও অমর হয়ে রয়েছেন।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ভেরার হযরত কাযী সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ সাহেব

মূল- রেয়াজ মাহমুদ বাজুয়া সাহেব

"ভেরার কাদিয়ানের সাথে সম্বন্ধ আছে। কারণ ভেরা থেকে আমার কাছে সাহায্য এসেছে।" (মসীহ মাওউদ আঃ)

বংশ পরিচয়

হযরত কাযী সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ সাহেবের সৈয়দ বংশের সাথে সম্বন্ধ ছিল। মুঘলদের শাসন আমলে তাঁর পূর্ব পুরুষগণ কাযীর মত মর্যাদাশীল পদে আসীন ছিলেন। এজন্য এ বংশের লোকদের কাযী নামে ডাকা হয়।

জন্ম ও আবাস

তিনি ভেরা জেলার (বর্তমানে মারগোদা জেলা) শাহপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৬৪ সালে। আহমদীয়তের ইতিহাসে ভেরা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যীকরে হাবীব বইতে আছে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একবার বলেন, 'ভেরার কাদিয়ানের সাথে সম্বন্ধ আছে। কারণ ভেরা থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি।'

[যিকরে হাবীব পৃঃ ১৬২-১৬৪, হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব]

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কিছু আত্মোৎসর্গকারী ও একনিষ্ঠ বুযুর্গ সাহাবী ভেরার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যার মধ্যে হযরত হাকীম মাওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল, হযরত মৌলভী ফযল উদ্দীন সাহেব। হযরত মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব, হযরত হাফেয গোলাম মহিউদ্দিন সাহেব, মিস্ত্রী কুতুবুদ্দীন সাহেব, এবং মোখাদ্দম মৌলভী মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব অন্যতম। এসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব সাহাবীরা ৩১৩ জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

১৯৫০ সালের ২৬ নভেম্বর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ভেরাতে যান। তিনি তাঁর বক্তৃতায় হযরত খলীফা মসীহ আওওয়াল (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, ভেরা ভেরাবাসীদের কাছে ইট-পাথর বা ইট-চুনের তৈরী এক শহর। কিন্তু আমার কাছে এটা ইট-চুনের দ্বারা বানানো শহর নয়। বস্তুত আমার শিক্ষক যিনি আমাকে খুবই ভালবাসা আর স্নেহের সাথে কুরআন করীমের তর্জমা শিখিয়েছেন এবং বোখারী শরীফের হাদীসও পড়িয়েছেন, তাঁর জন্মভূমি ও বাসস্থান। ভেরাবাসীরা ভেরার মায়েদের বুকের দুধ পান করেছে। আর আমি ভেরার এক বুযূর্গ অস্তিত্বের মুখ থেকে কুরআন করীম ও হাদীসের দুধ পান করেছি। ভেরাবাসীর কাছে ভেরা শহরের যে মর্যাদা, আমার কাছে এর মর্যাদা অনেক বেশি। (আল ফযল ২৯ নভেম্বর ১৯৫০)।

শিক্ষা জীবন

তাঁর শিক্ষা জীবন খুব চিত্তাকর্ষক। তাঁর পিতার ঘোড়া কেনা বেচার শখ ছিল। প্রথমে তাঁর মধ্যেও এ শখ ছিল। কিন্তু যৌবনে হঠাৎ তাঁর জীবনে এক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ শিক্ষা অর্জনের দিকে নিবদ্ধ করেন।

প্রাথমিক বইগুলি তিনি নিজের বাড়ীতে পড়েন। পরে হিন্দুস্থানের কয়েকটি শহর সফর করে অনেক কষ্টে শাহারানপুর পৌছান। বিভিন্ন মাদ্রাসা ছাড়াও তিনি বেশির ভাগ শিক্ষা শাহারানপুরের "মাজহারুল উলুম" মাদ্রাসা থেকে গ্রহণ করেন। শাহারানপুরের প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস মৌলভী মোহাম্মদ আলি সাহেব তাঁর হাদীস শরীফের শিক্ষক ছিলেন। হাদীস শরীফ শিক্ষার প্রতি তাঁর খুব ভালবাসা ছিল। হাদীস শিক্ষার প্রতি এই ভালবাসা তাঁর হৃদয়ে আঁ-হযরত (সঃ) প্রতি গভীর ভালবাসার সৃষ্টি করে। শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি একজন শিক্ষক হিসেবে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাতে তিনি নতুন বংশধরদের যথোপযোগী শিক্ষা দিতে পারেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের নোট যা ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালের আলফযলে প্রকাশিত হয় যে, তিনি ১৮৯৪ সালে অমৃতসরে "মাদ্রাসা আল্ মুসলেমিন" এ শিক্ষক ছিলেন। আর ভেরার আহমদীয়তের ইতিহাস (রচয়িতা মোকাররম আহমদ সাহেব বিসমিল)।

অনুসারে তিনি শাহারানপুরের "মাদ্রাসা মাজহারুল উলুম" এর শিক্ষক ছিলেন।

আহমদীয়ত গ্রহণ

হযরত সৈয়দ মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের মতে ১৮৯৩ সালে আথমের সাথে তর্কযুদ্ধের সময় অমৃতসরে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেণ। আর অমৃতসরের প্রথম আঞ্জুমান ফুরকানিয়ার সভাপতি মনোনীত হন [আলফযল -২৮ আগষ্ট ১৯৩০]।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানী বর্ণনা করেন 'তখন পর্যন্ত আঞ্জুমানের ব্যবস্থাপনা ও সিলসিলার প্রতিষ্ঠা হয়নি। খোদার ফযল ও রহমতে আমার মনে হয় যে অমৃতসরের বন্ধুদের সুশৃঙ্খল করা, তাদের পরস্পর সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করা এবং ধর্মীয় শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে একত্রিত করা দরকার। সেজন্য আঞ্জুমান ফুরকানিয়া নামে এক আঞ্জুমান স্থাপন করা হয়।' [আলফযল ২ ডিসেম্বর ১৯৩০]।

এ সময় আহমদীয়ত গ্রহণ করার জন্য তাঁর ওপর বিরোধীতা শুরু হয়। সে জন্য তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অমৃতসর থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে আসেন। এখানে তিনি খুব কম বেতনে "তালিমূল ইসলাম মাদ্রাসায় পড়ানো শুরু করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আদেশে ১৯০৬ সালের জানুয়ারীতে এ মাদ্রাসায় "ধর্মীয় শিক্ষার শাখা" খোলা হয়। হযরত কাজী

সাহেব প্রথম ও কাদিয়ানের হযরত মৌলভী ফযল দীন সাহেব দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। *[তাহরীখে আহমদীয়ত ৩য় খন্ড ৪৩০ পৃ:]*।

তাঁর সুস্পষ্ট গুণাবলী

- তিনি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ৩১৩ জন সাহাবীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য পান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম" পুস্তকের ৬১৬ পৃষ্ঠায় ৬ নম্বরে হযরত কাজী সাহেবের নাম লিপিবদ্ধ করেন। আর "আনযামে আথম" এর পরিশিষ্টের ৪২ পৃষ্ঠায় তাঁর নাম ৯০ নম্বরে উল্লেখ করেন। তাঁর এই দুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সৌভাগ্য ছিল। যার মহত্ত্বের ধারণা তুশের অধিবাসী আলি হামযা বিন আলির "জওহারুল আশরার" পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে করা যায়। তিনি তার পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় লেখেন মাহ্দী ওই গ্রাম থেকে বের হবেন, যার নাম "কাদীয়া", খোদাতাআলা এই মাহ্দীর স্বীকৃতি দেবেন। দূর দূরান্ত থেকে তাঁর বন্ধুদের জমা করবেন। যার সংখ্যা "বদর যুদ্ধে" অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ ৩১৩ জন হবে। আর এদের নাম যথারীতি বাসস্থান ও চরিতসহ ছাপানো বইতে লেখা হবে।

(পরিশিষ্ট আনযামে আথম-রূহানী খাযায়েন ১১ খন্ড ৩২৪-৩২৫ পৃ:]

- হযরত কাযী সাহেব শিক্ষা সমাপ্তির পর ভেরাতে আসেন। হযরত হাকিম নূরুদ্দীন সাহেবও এ সময় সেখানে ছিলেন। হযরত কাযী সাহেব তাঁর সাহচার্যের কল্যাণ লাভ করেন। তাঁর মধ্যে সততা ও নেকীর প্রভাব দেখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল নিজের ভাইজীকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এভাবে সাহচর্য আত্মীয়তায় পরিবর্তিত হয়। [তাহরীখে আহমদীয়ত ২য় খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা] ।
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) কাদিয়ানে কুরআন মজীদের দরস দিতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কুরআনের দরস দেয়ার জন্য তিনি সে সব বুযূর্গদের বলেন তাদের মধ্যে প্রথম হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (খলীফাতুল মসীহ্ সানী) তারপর হযরত মাওলানা সৈয়দ সরওয়ার শাহ সাহেব। আর তারপর ছিলেন হযরত কাযী সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ্ সাহেব *[তাহরীখে আহমদীয়ত ২য় খন্ড ৩৫৯ পৃঃ]*।
- মাদ্রাসা আহমদীয়ার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার পর্যবেক্ষণের জন্য এক লম্বা ভ্রমণে যান। তাঁর সাথে জামাতের বুযূর্গদের এক প্রতিনিধি দল ছিল। এতে হযরত কাযী সাহেবও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রতিনিধি দল ৩ এপ্রিল ১৯১২ তে কাদিয়ান থেকে রওনা হয়ে অমৃতসর, হরিদ্বার, লাখনু , বেনারস, কানপুর, শাহজাহানপুর , রামপুর, আম্বালা, দিল্লী ও শাহরানপুর শহর ভ্রমন করে ২৮ এপ্রিল ১৯১২ তারিখে কাদিয়ান ফেরত আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল এ প্রতিনিধি দলের কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সকলকে দাওয়াত করেন।

[তাহরীখে আহমদীয়ত ২য় খন্ড, ৪১৬ পৃ:]

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে কাদিয়ানে তবলীগী ক্লাস শুরু করেন। তিনি হযরত কাযী সাহেবকেও এ ক্লাসের শিক্ষক মনোনীত করেন।
- তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তবুও তিনি তাঁর সাথে সব সময় বিশ্বস্ততা রক্ষা করেন। আর প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়ের প্রমাণ দেন। খেলাফত অস্বীকারের ফেতনার সময় তিনি এর বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তাঁকে খুব ভালবাসতেন। হুযূর সিমলা থেকে ফেরার সময় নিজের ঘর আদ্বারে প্রথমে না গিয়ে অসুস্থ কাযী সাহেবকে দেখতে যান। তিনি তাঁর চৌপায়ীর পায়ের দিকে বসে পড়েন। তিনি উঠে বসতে চাইলে হুযূর তাঁকে উঠে বসতে সাহায্য করেন।

[আল ফযল -২ সেপ্টেম্বর ১৯৩০]

এ এক অদ্ভূত দৃশ্য ছিল। যা দর্শকদের ওপর এক আন্তরিক প্রেমের প্রভাব বিস্তার করে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ইমাম হওয়ার পর জামাতের কিছু বুযূর্গের ওপর স্বপ্ন ও ইলহামের দ্বারা তাঁর খেলাফতের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। এ সব বুযূর্গদের মধ্যে কাযী সাহেবও ছিলেন, যার ওপর তাঁর (রাঃ)-এর ইমাম হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায়। *(তাহরীকে আহমদীয়ত ৫ খন্ড ১১৯ পৃঃ)*।

১৯৯৮ সালের ১৯ অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ইনফ্লুয়েঞ্জার ভয়ংকর হামলার কারণে একটি ওসীয়্যত লেখেন। যাতে তিনি তাঁর পর খেলাফতের নির্বাচনের জন্য ১১ সদস্যের এক কমিটি মনোনীত করেন। যাতে হযরত কাযী সাহেবের নাম ছিল। এ কমিটির এ-ও ক্ষমতা ছিল যে তারা নিজেদের মধ্যে কাউকে খলীফা করতে পারেন কিংবা এমন ব্যক্তি যার নাম কমিটিতে নেই।

[তাহরীখে আহমদীয়ত, ৫ম খন্ড, ২৩৬ পৃ:]

- জামাতের ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুন এবং সংশোধন ও নেযারতের কাজ ১৯১৯ সালে শুরু হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) পরিচালনার জন্য হযরত মাওলানা সরওয়ার শাহ সাহেবকে এবং তার সাথে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব হালালপুরী এবং হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেবকে মনোনীত করেন। বিচারের জন্য হযরত কাযী সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ সাহেবকে মনোনয়ন দেন। *[তাহরীখে আহমদীয়া, ৫ খন্ড ২৪১-২৪২]*।

১৯২৪ সালের জুলাই মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ওয়েম্ব্লে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য প্রথমবার ইউরোপে যান। তিনি যাওয়ার পূর্বে কাদিয়ানে এক প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থাপনা রেখে যান। আর হযরত মাওলানা শের আলী সাহেবকে আমীর মনোনীত করেন। হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ - কে নায়েব আমীর মনোনয়ন দেন। এ ছাড়া ১৫ সদস্যের একটি মজলিসে শুরা গঠন করেন। যে মজলিসে শুরার একজন সদস্য ছিলেন হযরত কাজী আমীর হোসেন শাহ সাহেব। হুযূর ১১ জুলাই এক খুতবায় এই মজলিসে শুরার সদস্যদের সম্পর্কে বলেন, "বর্তমান অবস্থায় এসব ব্যক্তি আমার কাছে সব থেকে ভাল পরামর্শ দাতা"। এ ছাড়া সদস্যদের সম্পর্কে খুব প্রশংসা সূচক বাক্যে তাদের সেবা ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। কাযী সাহেব সম্পর্কে হুযূর বলেন, "কাজী আমীর হোসেন শাহ সাহেব নিজেদের লোক এবং খুবই একনিষ্ঠ।

[আলফযল ২২ জুলাই ১৯২৪]

স্বভাব চরিত

হযরত কাযী সাহেব শিক্ষা ও জ্ঞানে সিলসিলার আলেমদের মধ্যে খুব উচ্চ স্থানের অধিকারী। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মর্যাদা হযরত কাযী সাহেব অর্জন করেছিলেন তাতে তিনি অনন্য। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ সব লোকদের সাথে সময় কাটান যারা খুব উগ্রবাদী ছিল। আর নিজেদের ধারনায় কঠিন ও চরমপন্থী। কিন্তু আল্লাহতাআলা তাঁকে মুক্ত চিন্তার যে অলঙ্কার দান করেছিলেন তার জন্য তিনি অন্ধভাবে কোন কথা মানতে প্রস্তুত হতেন না। বস্তুত তিনি যা পড়তেন তা নিজে ভাবতেন এবং চিন্তাভাবনা করে একটা সিদ্ধান্তে নিজেই উপনীত হতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত সব সময় কুরআন মজীদ ও সহী হাদীস অনুসারে হত। তাঁর শিক্ষকরাও তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি যে বিষয়টি সত্য বলে স্বীকার করতেন তার জন্য কোন বিরোধিতাকে পরওয়া করতেন না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভয়ংকর মোখালেফাতের সময় তাঁকে কবুল করা কাযী সাহেবের মত একজন আলেমের জন্য বড় ত্যাগ ও একনিষ্ঠতার প্রকাশ ছিল। হযরত আকদসের সাথে তাঁর খুব ভালবাসা ও মহব্বত ছিল। কিছু কিছু বিষয়ে তিনি নিজের অনুসন্ধানের দ্বারা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাছ থেকে যখন শোনেন যে তিনি বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত অনুসন্ধান ত্যাগ করেন। তিনি হযরত (আঃ) এর মজলিসে কখনও প্রশ্ন করতেন না। তিনি বৃথা সময় নষ্ট করার বিষয়ে সংযমী ছিলেন। সব কাজ তিনি সময় মত করতেন। তাঁকে কোন সভায় ডাকলে তিনি সময় মত উপস্থিত হতেন। বস্তুত তিনি সকলের আগে পৌছানো লোকদের মধ্যে হতেন।

কুরআনের আদেশ অনুসারে তিনি লেনদেনে পরিষ্কার ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক ব্যক্তি নেক কাজের জন্য কিছু সম্পত্তি কাযী সাহেবের নামে কেনেন। তিনি নিজের অসুস্থতার সময় তা সকলের কাছে প্রকাশ করে দেন যে, আমার এ সম্পত্তির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এটা ওই ব্যক্তির সম্পত্তি।

[আলফযল ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০]

তাঁর স্বভাব বিশ্লেষণধর্মী ছিল। কুরআন হাদীসের অনেক স্থানে তিনি স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন। তিনি দীর্ঘকায়, সুদর্শন ও লাল আভাযুক্ত পরিষ্কার রংয়ের ছিলেন। তাঁর পোষাক সাদাসিধা কিন্তু পরিষ্কার হত। তিনি অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন। সারা জীবন ধর্মের সেবায় ব্যস্ত থেকেছেন।

তিনি ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও দয়ালু ছিলেন। প্রাঞ্জল ও আনন্দদায়ক কথা বলতেন। সামান্য কয়েকটি বাক্যে বড় অর্থবোধক কথা বলতেন। আলাপ আলোচনা শিষ্টাচারে পূর্ণ ও বাকধারা সমৃদ্ধ হত। তার খ্যাতি সম্পন্ন শিষ্যদের মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ব্যতীত হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন সাহেব সামস ও মাওলানা আবুল আতা সাহেবও অন্তভুক্ত ছিলেন। *[ভেরা কী তাহ্রীখে আহমদীয়ত ৫৮ পৃঃ]*

তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যু

তাঁর অসুস্থতার বিষয়টি বেশ লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু এ দীর্ঘ অসুস্থতার সময় তিনি আল্লাহ্তাআলার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার শক্তিশালী প্রমাণ দেন। অসুস্থতার সময় বার বার এমন হত যে মনে হত এখন তাঁর অন্তিম সময়। কিন্তু তিনি বেঁচে যেতেন। এটা ওই হাদীসের বাস্তব দৃশ্য যাতে আছে যে, খোদাতাআলা তাঁর নেক বান্দাদের রূহ কবজ করতে বিলম্ব করে। তবু মৃত্যুর একটা সময় নির্ধারিত আছে। ২৪ আগষ্ট ১৯৩০ তারিখে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ২৫শে আগষ্ট এক বড় জামাত হযরত মাওলানা সৈয়দ সরওয়ার সাহেবের একতেদাতে জানাযার নামায পড়ে। পরে তাঁকে কাদিয়ানের বেহেশ্তী মাকবেরাতে দাফন করা হয়। *[আলফযল ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩০]*।

বংশধর

১৯৩০ সালের ২রা আগষ্ট আলফযলে প্রকাশিত হযরত মীর সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের নোটে বর্ণনা করা হয় যে, হযরত কাযী সৈয়দ আমীর হোসেন সাহেব কয়েকটি বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর অনেক বাচ্চা মারা যায়। তাঁর মৃত্যুর সময় শোক সন্তপ্ত পরিবারের মধ্যে ছিল ১ বেওয়া ও ৫ বাচ্চা।

ভেরার আহমদীয়তের ইতিহাস লেখক মোকাররম ফজলুর রহমান ঝিলমিল সাহেব তাঁর এক ছেলে সাইদ সাহেবের উল্লেখ করেন। সংক্ষেপে বলা যায় হযরত কাযী সাহেব আহমদী সিলসিলার সুখ্যাত আলেম ছিলেন। আর কাশফ দেখার সৌভাগ্যশালী বুযূর্গ ছিলেন। জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে আলেমদের একটি দল তিনি তৈরী করেন। তিনি হযরত আকদসের প্রকৃত প্রেমিক এবং একনিষ্ঠ ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন।

[সৌজন্যে মাসিক আলফযল, রাবওয়া, মে, ১৯৯৭ সংখ্যা]

অনূদিত ঃ কওসার আলি মোল্লা

দোয়ার বরকত

মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব, কুরআনের ভাষায় 'আশরাফুল মাখলুকাত'। আল্লাহ্তাআলা মানুষকে অধিক সম্মান লাভের অধিকারী করেছেন। কারণ মানুষ পারে তাঁর গুণে গুণান্বিত হতে, পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁর প্রিয় বান্দা হতে। তাই মানুষ যখন তাঁর অবাধ্য হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় তখন যুগে যুগে তিনি তাদের হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার জন্য পৃথিবীতে বহু নবী রসূল পাঠিয়েছেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরই এবাদতের জন্য এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমগ্র বিশ্বের জন্য শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে পাঠিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ ও শেষ বিধান হিসাবে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন। কুরআন করীম সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন " নিশ্চয় আমরা এই যিকর (কুরআন) নাযেল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাজতকারী। কুরআন পাক হলো আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত বান্দার জন্য সঠিক পথের পথনির্দেশিকা। মহা প্রলয় সংগঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র কুরআনের শিক্ষাই পৃথিবীতে বলবৎ থাকবে। এ শিক্ষাকে মানুষের জন্য বাস্তবে রূপদান করেছেন নবী করীম (সঃ) তাঁর নিজ জীবনে।

কুরআন পাক বলে দিয়েছে আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উপায়সমূহ। কিভাবে বান্দার সংগে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং দোয়া বা প্রার্থনা, ভাল-মন্দ, ভুল-ভ্রান্তি, হালাল-হারাম, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দেশ পরিচালনা প্রভৃতিসহ সব বিষয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এতে মানুষের জাগতিক, আধ্যাত্মিক, পরকালীন জীবন ও পুরস্কারের কথাও বলা হয়েছে। দোয়া বা প্রার্থনা হলো এসবের মধ্যে একটি বিশেষ পন্থা বা ব্যবস্থা যা খোদাতাআলা ও বান্দার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়। রসূলে পাক (সঃ) এর জীবনে উল্লেখিত এসব কিছুরই বাস্তবায়ন ঘটেছিল। আল্লাহ্তাআলা তাই বলেছেন, 'নিশ্চয় তোমাদের জন্য 'আল্লাহর রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে।
(সূরা ঃ আহ্যাব, আয়াত: ২২)।

নবী করীম (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্তাআলা আরো বলেছেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্ কে ভালবাস তা হলে তোমরা আমার অনুসরণ কর।'
(সূরা : আল ইমরান, আয়ত: ৩২)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ কুরআন।' তাই আল্লাহ্র আদেশ ও রসূলে পাক (সঃ) এর সুন্নত পালনের মাধ্যমেই মানুষ হতে পারে আল্লাহ্তাআলার প্রিয় বান্দা।

কুরআন পাক এবং সুন্নাহর আলোকে এবার মূল আলোচ্য বিষয় 'দোয়ার বরকত' সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। কুরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমার কাছে দোয়া কর আমি নিশ্চয় উত্তর দিব'। (সূরা: মোমেন, আয়ত: ৬১)। তিনি আরো বলেছেন, 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর (দোয়াকারীর) প্রার্থনার উত্তর দেই। যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে।
(সূরা : বাকারা , আয়াত: ১৮৭)।

সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহ্তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করেছেন, যা হাদীসের দোয়া হিসাবে মানুষের জন্য অমূল্য সম্পদ ও পাথেয় হয়ে রয়েছে। দোয়া করার জন্য তিনি এতই ব্যাকুল ছিলেন যে, প্রাণ ভরে দোয়া করে তৃপ্ত হওয়ার জন্য নিরিবিলি স্থান হিসাবে হেরা পর্বতের গুহাটি বেছে নিয়েছিলেন। পাহাড়ে উঠে সে গুহায় প্রবেশ করা ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু তাঁর কাছে তা কষ্টকর মনে হতো না। কারণ তিনি আল্লাহ্তাআলার ভালবাসা নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশী ছিলেন।

দোয়া সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'দোয়া হল এবাদত এবং এবাদতের মূল হলো দোয়া। (তিরমিযি)। তিনি আরো বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করা তিনি ভালবাসেন। (তিরমিযি) নবী করীম (সঃ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ দোয়াকারী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে, তাহাজ্জুদের নামাযে, নফল এবাদতের সিজদায়, রুকুতে দাড়িয়ে বসে এত অধিক দোয়া করতেন যে, দীর্ঘ সময় দাড়ানো ও রুকুতে থাকার কারণে তাঁর পা ফুলে যেত। এ ছাড়া সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহতাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করেছেন, যা হাদীসের দোয়া হিসাবে মানুষের জন্য অমূল্য সম্পদ ও পাথেয় হয়ে রয়েছে। দোয়া করার জন্য তিনি এতই ব্যাকুল ছিলেন যে, প্রাণ ভরে দোয়া করে তৃপ্ত হওয়ার জন্য নিরিবিলি স্থান হিসাবে হেরা পর্বতের গুহাটি বেছে নিয়েছিলেন। পাহাড়ে উঠে সে গুহায় প্রবেশ করা ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু তাঁর কাছে তা কষ্টকর মনে হতো না। কারণ তিনি আল্লাহ্তাআলার ভালবাসা নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশী ছিলেন। দুনিয়াবী লোভ, আরাম-আয়েশ, লালসার প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, ক্ষমতার লিপ্সা তাঁর কখনো ছিল না। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য, সত্যকে উপলব্ধির জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাইতো তিনি আল্লাহ্তাআলার প্রিয় বান্দা ও রসূল এবং মানব জাতির জন্য 'হেদায়াতকারী ও শাফায়াতকারী এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতুল্লিল আলামীন।

কুরআন পাক হতে জানা যায় রসূলে করীম (সঃ) এর পূর্বে আগত সকল নবী ও পয়গম্বরগণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের জন্য দোয়া করেছেন। সকল প্রকার মুশকেলাতও প্রতিবন্ধকতা দোয়ার মাধ্যমেই তাঁরা মোকাবেলা করে কৃতকার্য হয়েছেন। রসূলে করীম (সঃ) এর আদর্শ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত দোয়াকারী কখনো নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য চুক্তি সাপেক্ষে দোয়া করেন না। মানুষের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে তার মঙ্গল কামনা ও সৎপথে থাকার জন্য দোয়া করেন। তাঁদের কোন কামনা বাসনা থাকে না। আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য। এরাই হলেন আদর্শ দোয়াকারী এবং আল্লাহ্তাআলার প্রিয় বান্দাগণ নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ্তাআলার সান্নিধ্য লাভ করেন এবং একান্তভাবে আপন আবেগে খোদার সমীপে মনের সব কথা ব্যক্ত করেন। রসূল করীম (সঃ) তাই বলেছেন, 'নামায মু'মিনের মেরাজ স্বরূপ'। তাহাজ্জুদ নামায হলো দোয়ার এক বিশেষ মাধ্যম। বিশ্ব চরাচর তখন কোলাহলমুক্ত থাকে, বান্দা তখন একান্তভাবে খোদার সমীপে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে দোয়ায় রত হয়ে থাকে। বিগলিত চিত্তে তার মনে সবকিছু ব্যক্ত করে। এ সময় আল্লাহ্তাআলা বান্দার অনেক নিকটে চলে আসেন। এ এবাদতের মজাই আলাদা। নফল নামাযের মাধ্যমেও দোয়া করার সুযোগ রয়েছে। নবী করীম (সঃ) দোয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করেছেন,

আল্লাহ্তাআলার শোকর গুজারি করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভাব অভিযোগের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, এমন কি যখন জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তার জন্যও, লবণের জন্য । (তিরমিযি)। এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, 'যে আল্লাহ্র নিকট কিছু চায় না তার প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট ।' *(তিরমিযি)*।

কুরআন পাকে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত নূহ্ (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত আইউব (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ) এবং নবী করীম (সঃ) সহ সকল নবীগণের দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে বিবি হাওয়া, ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া, মদীনার আনসারগণের দোয়া, বনী ইসরাঈলের দোয়া, হযরত ঈসা, (আঃ) এর মান্যকারী আসহাবে কাহ্ফ অর্থাৎ গুহার অধিবাসী বলে কথিত যুব সম্প্রদায়ের দোয়া, হযরত মূসা (আঃ) এর উপর ঈমান আনয়নকারী যুবকদের দোয়া এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী যাদুকরদের দোয়া, হযরত ঈসা (আঃ) এর হাওয়ারীগণের দোয়া, তালুত এর সৈন্য বাহিনীর দোয়া। সব দোয়াই ছিল আল্লাহ্তাআলার প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা, শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়া, বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া, সত্যে কায়েম থাকা, পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, ক্ষমা ও করুণা লাভ, শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ, পাপ থেকে মুক্তি লাভ, দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া, ধৈর্য ও উত্তম পরিণাম লাভ, পবিত্র জামাতে দাখেল হওয়া, পূর্ণ-ভরসাও ঐশী সন্তুষ্টি লাভ, যান-বাহনে চড়া, অত্যাচারীদের ধ্বংস হওয়া, সফলতা লাভ, পুণ্যবান সন্তান লাভ, পিতা মাতার জন্য করুনা লাভ, জ্ঞান বৃদ্ধি, তবলীগে সফলতা লাভ, উত্তম প্রজন্ম লাভ মোট কথা মানব জীবনে চলার পথে নিজ প্রয়োজনসহ আল্লাহ্তাআলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাঁরা দোয়া করেছেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁদের প্রার্থনা কবুল করেছেন এবং দোয়ার বরকতে সকল সমস্যা দূর হয়েছে। মানবকুল যেন এসব দোয়া থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে। আল্লাহ্পাক তাই কুরআন করীমে এসব দোয়ার উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ নিকট প্রার্থনা ব্যতীত এত অধিক সম্মানিত জিনিস আর নাই।' (তিরমিযি)। তাইতো তিনি রাতে ঘুমানোর দোয়া, ঘুম থেকে জেগে দোয়া এবং প্রত্যুষে দোয়া পাঠের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের কাজ শুরু করতেন। সারাদিন যে সব কাজ করতেন তার পূর্বেও দোয়া করতেন, কোন কাজই দোয়া ব্যতিরেকে করতেন না। তাঁর দোয়ার কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেখ করছি। যেমন- ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া, নুতন কাপড় পরার দোয়া, রুগী দেখার দোয়া, বিয়েতে বর-কনেকে দোয়া, বৃষ্টির জন্য দোয়া, নতুন ফল খাওয়ার পর দোয়া, বিদ্যুৎ চমকানোর সময় দোয়া, উঁচুস্থানে ওঠা ও নামার দোয়া, হাঁচি দেয়ার পর দোয়া, রোযা খুলার দোয়া, নতুন চাঁদ দেখার দোয়া, কদরের রাতের দোয়া। এভাবে দোয়া করেই তিনি আল্লাহ্তাআলার নিকট অধিক সম্মানিত হয়েছেন। দোয়ার মাধ্যমে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও বরকত লাভের প্রকৃষ্ট নমুনা হলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। আল্লাহ্তাআলার নির্দেশ পালন ও দোয়ার বরকতে তিনি চিরস্থায়ী সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি আল্লাহ্তাআলার আদেশ মোতাবেক প্রাণ প্রিয় শিশু পুত্র এবং স্ত্রী বিবি হাজেরাকে অনুর্বর, জনমানব শূণ্য উপত্যকা যা ছিল মানুষের বসবাসের অযোগ্য সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। সামান্য খাদ্য ও পানীয় এর ব্যবস্থা করে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি দোয়া করেছিলেন, ' হে আমার প্রভু! এ শহরকে (অর্থাৎ মক্কাকে) তুমি শান্তি-ধাম করো আর আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রতিমার উপাসনা থেকে দূরে রেখো।'
(সূরা : ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৬)।

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর থেকে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করিয়েছি। হে আমার প্রভু! তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং তুমি লোকদের হৃদয়কে এমন করে দাও যে তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদেরকে ফল-ফলাদির খাদ্য-সামগ্রী দান করো যেন তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৮)।

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর থেকে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করিয়েছি। হে আমার প্রভু! তাঁরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং তুমি লোকদের হৃদয়কে এমন করে দাও যেন তারা তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁদেরকে ফল ফলাদির খাদ্য-সামগ্রী দান করে যেন তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' *(সূরা ইব্রাহিম, আয়াত : ৩৮)*।

'হে আমার প্রভু! আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী কর। হে আমাদের প্রভু! আমার দোয়া কবুল কর।' *(সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪১)* ।

আল্লাহ্তাআলা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং বরকত স্বরূপ তিনি পুনরায় প্রিয়তমা স্ত্রী এবং প্রাণপ্রিয় পুত্রের সাথে মিলিত হন। তখন তিনি দেখতে পান, যে জনশূণ্য, অনুর্বর উপত্যকা মক্কায় তিনি তাঁদেরকে ছেড়ে গিয়েছিলেন, তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানে গড়ে উঠেছে এক জনবহুল নগরী, সুপেয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা সেখানে হয়ে গেছে। সে কারণে মানুষ এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্য করতে শুরু করেছে। ফল-ফলাদিসহ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রাচুর্যময় এক শহরে রূপান্তরিত হয়েছে সেই অনুর্বর উপত্যকা, যেখানে আজ পবিত্র মক্কা নগরী দন্ডায়মান। সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য-পবিত্র স্থান এই মক্কা নগরী এবং শান্তি-ধাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বংশধরই পৃথিবীতে নামায প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল্লাহ্তাআলার নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কে নিয়ে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের পর দোয়া করেছিলেন, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট হতে (এই সেবা) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে তোমার জন্য আত্মসমর্পনকারী কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হতেও তোমাদের এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি কর, এবং তুমি আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন কর, এবং আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর, কারণ তুমিই পুনঃপুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।'

'হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে তাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর, যে তাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'
(সূরা: আল বাকারা, আয়াত: ১২৮, ১২৯, ১৩০)

আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া কবুলীয়্যত এবং বরকতের ফল স্বরূপ পরবর্তীতে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁর মাধ্যমে এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি হয়। কুরআন করীম অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি ও পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। রসূল করীম (সঃ) পৃথিবীতে যে আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি করেছেন তাঁদের দ্বারা হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাঈল

(আঃ) এর সম্মান ও মর্যাদা স্থায়ীভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং মহা প্রলয় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'দোয়া হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর সরল, নেক বান্দার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণসুলভ ইতিবাচক সম্পর্কের অপর নাম। আল্লাহ্‌র করুণা ও কল্যাণ বান্দাকে আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করে। বান্দা যতই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকতার সাথে তাতে সাড়া দেয়, আল্লাহ্ ততই তার নিকটে আসেন। দোয়ার মাধ্যমে এ সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌছায় এবং এমন এক বিশিষ্ট গুণ ধারণ করে, যা আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে।'

'প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি যত উপায়-উপকরণ যুগিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে অধিক শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হল দোয়া। দোয়ার মতো কার্যকরী অন্য কিছু নাই।'

'মনে রাখা দরকার, বিনয় ও কাতরতাই দোয়ার একমাত্র শর্ত নয়। অন্যান্য বহু শর্ত রয়েছে।, যেমন-ধর্ম ভীরুতা, পবিত্রতা, সত্য-বাদিতা, সংশয়াতীত অটল বিশ্বাস, খোদা-প্রেম, একাগ্রচিত্ততা ও গভীর অভিনিবেশ ইত্যাদি।' *(বারাকাতুদ্‌দোয়া, পৃ: ৮,১০,১৪)*।

'যখন তুমি দোয়ার জন্য দন্ডায়মান হও তখন তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিৎ যে, তোমার খোদা সব কিছুর উপর শক্তিশালী। তবে তোমার দোয়া গৃহীত হবে এবং তুমি খোদার কুদরতের আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখবে।' *(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৪২)*

'ইহা আমার উপদেশ, যা আমি সমগ্র কুরআনের উপদেশাবলীর মস্তিষ্ক মনে করি। কুরআন শরীফে ৩০ পারা রয়েছে এবং সেগুলোর সবই উপদেশে ভরপুর। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি জানে না যে, সেগুলোর মধ্যে উপদেশ কোন্‌টি যার উপর মজবুত হয়ে গেলে ও সেটির উপর পূর্ণ 'আমল' করলে কুরআন করীমের সকল আদেশের উপর চলার ও সকল নিষেধ হতে বাঁচার তওফীক লাভ করা যায়। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি যে ঐ চাবিকাঠি ও শক্তি হল দোয়া। দোয়াকে মজবুতীর সাথে আঁকড়ে ধর। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, এরূপ করলে আল্লাহ্‌তাআলা সকল মুশকিলাত সহজ করে দিবেন।' *(মলফূযাত, খন্ড-৭, পৃ: ১৯৩, ১৯৪)*।

আল্লাহ্‌তাআলার প্রত্যাদিষ্ট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইসলামের শিক্ষা ও এর সৌন্দর্যকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাই ব্যবস্থা নিয়েছেন যুদ্ধ বিগ্রহ, সংগ্রাম বা বল প্রয়োগের মোকাবেলা করবেন, দোয়ার মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সে কারণে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'এ যুগে তলোয়ার বা অন্য কোন অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ।' তিনি ইসলামের সৌন্দর্য বিকাশ এর প্রচার ও প্রসারের জন্য হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাহাস, ক্ষুরধার লেখনী, উন্নত আখলাক, জোড়ালো বক্তৃতা এবং সর্বোপরি তাঁর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করেছেন। যে কোন বিরোধিতা, জটিল-বড় বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছেন দোয়ার মাধ্যমে। এভাবেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছে। তাঁর জামাতভূক্ত আহমদীগণকে তিনি এ শিক্ষাই দিয়েছেন, তাই তারা দুষ্ট চক্র ও সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী আলেম, ধর্মীয় নেতাদের সুপরিকল্পিত নানা ধরনের বাঁধা সৃষ্টিতে কখনো বিচলিত হন না, বরং নির্ভয়ে একাগ্রচিত্তে, কায়মনোবাক্যে দোয়া দ্বারা সব বাঁধা ও সমস্যার মোকাবেলা করে থাকেন। তাঁরা জানেন দোয়াই হলো সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র হাতিয়ার। কারণ শুরু থেকেই জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিরুদ্ধে এরূপ বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে আসছে,আর তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে জামাত তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে এবং সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত জামাতের এটাই প্রামাণ। যতই বিরোধিতা হবে ততই এর প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে ব্যাপ্তি লাভ করবে। কোন অসত্য ও মিথ্যাচারীতা এর কোন ক্ষতি করতে পারেনি, পারবেও না। ইন্‌শাআল্লাহ্! কারণ আহমদীদের কাছে দোয়ার অস্ত্র রয়েছে আর রয়েছে কুরআনের শিক্ষা ও রসূলে পাক (সঃ) এর জীবনাদর্শ! সে জন্য এ জামাতের লোকেরা কোন বাঁধাকেই পরোয়া করে না। তাই এ জামাতের অগ্রগতি দ্রুত হতে আরো দ্রুততর হয়েছে।

'এ যুগের তথা মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগের হাতিয়ার হলো দোয়া। এ ছাড়া আমরা প্রকৃত পক্ষেই অচল, অক্ষম। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে কেবল দোয়ার অস্ত্রই দান করেছেন। এ যুগে ইসলামের বিজয় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে সকরুণ দোয়ার মধ্যে নির্ধারিত। এটি সেই অস্ত্র যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছাড়া অন্য কোন ধর্মের বা ফির্কার কাছে নেই। অতএব বর্তমানে যা অন্য কারও কাছে নেই সেই দোয়ার অস্ত্র আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে কেবল আমাদেরকেই দিয়ে রেখেছেন, এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এমনই একজন মানুষ যিনি দোয়া করে কখনো ক্লান্ত হতেন না। তাঁর জামাতভূক্ত আহ্‌মদীদেরকেও তিনি দোয়া করতে শিখিয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর খলীফাগণ একইভাবে দোয়ার মাধ্যমে এবং ইসলামের শিক্ষাকে পাথেয় করে সমগ্র বিশ্বে এর সৌন্দর্যকে তুলে ধরছেন। নিজেদের চেষ্টা ও পরিশ্রম বাস্তবায়নের জন্য আহমদীগণ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে এবং দোয়ার বরকতেই ক্ষুদ্র একটি গ্রাম কাদীয়ান থেকে ইসলামের যে প্রচার কাজ শুরু হয়ে ছিল তা এখন সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। আহ্‌মদীগণ সগৌরবে ইসলামের সৌন্দর্যকে প্রসার ঘটিয়েছে এবং একে শক্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। সুবহানআল্লাহ্। দোয়া যে কত বরকতময়, শক্তিশালী, ফলদায়ক এবং কার্যকর তার বাস্তব নমুনা পৃথিবীতে প্রদর্শন করেছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত।

আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) আহমদীয়া জামাতের ইমাম মোখালেফাতের প্রেক্ষাপটে এর মোকাবেলার জন্য জামাতকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'এ যুগের তথা মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগের হাতিয়ার হলো দোয়া। এ ছাড়া আমরা প্রকৃত পক্ষেই অচল, অক্ষম। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে কেবল দোয়ার অস্ত্রই দান করেছেন। এ যুগে ইসলামের বিজয় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে সকরুণ দোয়ার মধ্যে নির্ধারিত। এটি সেই অস্ত্র যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছাড়া অন্য কোন ধর্মের বা ফির্কার কাছে নেই। অতএব বর্তমানে যা অন্য কারও কাছে নেই সেই দোয়ার অস্ত্র আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে কেবল আমাদেরকেই দিয়ে রেখেছেন, এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

আল্লাহ্ করুন খলীফায়ে ওয়াক্ত এর উপদেশ মতো আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল ভাই-বোন দোয়ায় অভ্যস্ত হয়ে এর বরকত ও ফায়দা হাসিল করার তৌফীক লাভ করেন। আমীন।

মাকসুদা রহমান

মেদভুঁড়ি ও হার্ট অ্যাটাক

আপনি নামি দামী শহরে থাকেন। সৌখিন মানুষ, সুন্দর মন। গাড়িটি দামী, এয়ারকন্ডিশন, লিফ্‌ট ছাড়া চলেন না। চটকদার বিজ্ঞাপনওয়ালা দামী খাবার আপনার ডাইনিং এ সব সময় শোভা পায়। বিরাট সাইজের একটি থলথলে ভুঁড়ি। কোমরের মাপ ২০০ সে. মি. ছেড়ে গেছে। খেতে বসতে, হাঁটতে আপনার কষ্ট হয়। আপনি খাবারের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছেন। আপনি নিজে তো বেখেয়ালী বটেই আপনার আশে পাশে যারা বসবাস করেন তারাও ঘুমিয়ে সময় কাটান। হুঁশ তাদেরও কম। মেদভুঁড়িওয়ালা মানুষটি আপনি এখন হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত। চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

মজার খাবার খেতে সবাই পছন্দ করে আপনিও তেমন। প্রয়োজনের বেশি সবকিছুই ক্ষতিকর - হোক না তা খাবার। অতিরিক্ত খাবার খেয়ে আপনি হতে পারেন -উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ মেদভঁড়ি এবং ডায়াবেটিস নামক রোগের একজন স্থায়ী সদস্য। মেদ জমাকে এক সময় রোগ হিসেবে ধরা হতো না। কিন্তু বর্তমানে মেদভুঁড়ি নিয়ে সবাই চিন্তিত। কারণ অতিরিক্ত ওজন জীবন যাপনের জন্য অন্তরায়। বিজ্ঞানীদের মতে তাতে আয়ু গড়ে ৯-১০ বছর কমে যায়। অতিরিক্ত মেদ বা শারীরিক ওজন হৃদরোগ, ডায়াবেটিস টাইপ-২, উচ্চ রক্তচাপ ও ষ্ট্রোকের অন্যতম কারণ। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।

শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। এজন্য দায়ী বাহিরের আকর্ষণীয় চটকদার বিজ্ঞাপনধারী খাবার, ফাষ্ট ফুড, পানীয়, চকলেট, চুইংগাম ও আইসক্রীম। আধুনিকতার নামে আমরা অসচেতন হয়ে মুর্খের মত কাজ করছি। বাচ্চাদেরকে ঘরের খাবারের প্রতি আকৃষ্ট না করে বাহিরের ক্ষতিকর খাবার, অতিরিক্ত চর্বি ও ফ্যাটযুক্ত খাবারের প্রতি আকৃষ্ট করে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলছি। বাহিরের খাবার খেয়ে তাদের কাছে ঘরের তৈরী খাবার বিস্বাদ মনে হয়। আর আমরা কাজ কমানোর জন্য বেছে নিয়েছি ঐ পথ। ফলে শিশুদের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগের হার অনেক বাড়ছে। অন্যান্য দেশে এর সঠিক পরিসংখ্যান করা হচ্ছে এবং রোধ কল্পে নেয়া হচ্ছে পরিকল্পনা আবার বাস্তবায়নও করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে মোটা লোকদের ওজন কমানোর চিকিৎসায়। আমাদের দেশে যারা হার্টের রোগী, উচ্চরক্ত চাপে ভোগে, ডায়াবেটিস আক্রান্ত তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই অতিরিক্ত মোটা কিংবা মেদভুঁরি সম্পন্ন। আমাদের দেশে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০টি পরিবার নুন আনতে পান্থা ফুরায়। তবু কেন আমাদের এ ঘোড়া রোগ? এ নিয়ে কিছু গবেষণা করা হচ্ছে। মানুষ মোটা বা মেদ সম্পন্ন হচ্ছে কেন? এ নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে যারা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এবং অলসভাবে যারা জীবন কাটায়, বসে থাকার চাকুরী বা কাজ করে তারা মেদ জমা রোগে আক্রান্ত হয়। আবার পুরুষের চেয়ে মহিলারা বেশি স্থূলতায় ভোগেন। খাদ্যের শক্তি সরবরাহকারী তিনটি উপাদান যেমন-আমিষ, চর্বি বা ফ্যাট এবং শর্করা বেশি গ্রহণ বা মোটা হওয়ার কারণ। অতিরিক্ত আমিষ এবং শর্করা খেলেও তা পরে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে দেহে জমে। দেহে আছে প্রচুর চর্বি বা মেদ কোষ। সেখানে জমা থাকে চর্বি। শিশু বয়সেই মেদ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বেশি বয়সে নয়। মেদ কোষ পরিণত বয়সে সংখ্যায় না বেড়ে আয়তনে ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে একটি মেদ কোষে প্রচুর পরিমাণে মেদ জমে। মুখের গালে, ঘাড়ে, কোমড়ে, নিতম্বে, পেটে মেদকোষ থাকে। অতিরিক্ত চর্বি জমে একজন সুদর্শন ব্যক্তির বা সুদর্শনার সব সৌন্দর্য বেমানান করে দেয়। । ধরুন একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের শক্তির চাহিদা ২ হাজার ৫০০ক্যালরি। সে যদি দৈনিক আরো ৬০ ক্যালরি বেশি খাবার খায় তবে প্রতি মাসে ১ হাজার ৮০০ ক্যালরি বেশি গ্রহণ করবে। আমাদের জানামতে ৩হাজার ২০০ ক্যালরি খাদ্য ১ পাউন্ড ওজন বাড়ায়। দুই মাস পর সেই ব্যক্তির প্রায় ১ পাউন্ড ওজন বাড়লে ১বছরে ৬-৭ পাউন্ড অতিরিক্ত ওজন বাড়বে। এবার বলুন কয়েক বছর পর লোকটি অবস্থা কি হতে পারে।

আবার বেশি মোটা হলেই 'ওবেসিটি' বা মেদজমা হওয়া নয়। যাদের পেশী মজবুত এবং বড়সড়ো স্বাভাবিকভাবে অন্যের তুলনায় তাদের ওজন বেশি। দেহের চর্বির কারণে অতিরিক্ত ওজন হলে তাকে 'ওবেসিটি' বা স্থূলতা বলা হয়। বিজ্ঞানীরা আরো দেখেছেন যে, আমাদের দেহের বেশ কিছু জিন শক্তি গ্রহণ ও খরচে সাহায্য করে। একটি জিন যাতে একটি প্রোটিন ও লেপ্‌টিন থাকে এবং ফ্যাট কোষে তৈরী হয়ে রক্তে মিশে। এই লেপটিন নিউরো পেপটাইড 'ওয়াই' নামক এনজাইম তৈরীতে বাধা দেওয়ায় খাদ্য গ্রহণ বেড়ে যায়। খাদ্য গ্রহণের উপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায় এবং রক্তে ইনসুলিন বেড়ে যায়। ফলে মেদ বা মাত্রাতিরিক্ত মোটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কারো কারো বেশি ফ্যাট জমে বা কম পরিমাণ লিপিড ব্যবহারের জন্য শক্তিকে চর্বি কোষে রূপান্তরিত করে এবং জমা লিপিডকে কম ব্যবহার করে। ফলে স্থূলতা বাড়ে। এভাবেই চর্বি জমা হয় দেহের বিভিন্ন অংশে জমা হয় শিরায়-দমনীতে। আর হৃৎপিন্ডের ধমনিতে চর্বি জমে ঘটে বিপত্তি। নাম তার হার্ট অ্যাটাক। মস্তিষ্কে হয় ব্রেইন ষ্ট্রোক। আমাদের দেশে মোটা মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের মতো গরীব দেশেও খাওয়া দাওয়ায় আনন্দ-উল্লাসের সংস্কৃতির পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক শিল্পোন্নত দেশের মতো। আজকাল গবেষণায় দেখা গেছে-যারা মেদ স্থূলতায় ভোগে তাদের লিভারে 'ন্যাশ' নামক খারাপ রোগ ধরা পড়ছে। অর্থাৎ নন-এলকোহলিক স্টিয়াটো হেপাটাইটাস দেখা গেছে। এ রোগে যারা আক্রান্ত তাদের শতকরা ২০ জনই মেদ ভুঁড়িওয়ালা লোক। যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণায় দেখা গেছে, কেবল মেদ বা স্থূলতা সম্পর্কিত রোগ যেমন হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসেই প্রতি বছর প্রায় ৩ লাখ লোক

মারা যাচ্ছে। মহিলারা আরো ৫ গুণ ঝুঁকিতে রয়েছে। একজন মানুষ একদিনে বা হঠাৎ করেই মেদওয়ালা বা মাত্রাতিরিক্ত মোটা হয় না। প্রায় ২০-২৫ বছর স্বাভাবিক থাকার পরই ধীরে ধীরে মোটা বা মেদওয়ালা হয়। একজন ব্যক্তি কতটুকু স্থূল এবং এই অতিরিক্ত স্থূলতায় হৃদ রোগের ঝুঁকি কেমন বা হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে আছেন তার কতটুকু চর্বি কমানোর প্রয়োজন-চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখন তা সহজেই যাচাই করেন।

কোমরের মাপ নির্ণয়ও হৃদ রোগে ঝুঁকি নিরূপনে গুরুত্ব বহণ করে। কারণ তলপেটে প্রচুর চর্বির আধিক্য হৃদ রোগের ঝুঁকি। এ চর্বি কোমরের মাপের সাহায্যেই বলা যায়। যদি একজন পুরুষের কোমরের মাপ ১০২ সেঃমিঃ এর বেশি এবং মহিলাদের ৮৮ সেঃ মিঃ এর বেশি হয় তবে হৃদ রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। যাদের মেদকোষ যত বেশি ওজন কমাতে তাদের ততবেশি কষ্ট। তবে একথাও সত্যি যেখানে সমস্যা সেখানেই সমাধানও রয়েছে। সমাধানের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম, আদর্শ খাদ্যাভাস ও দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যাহিক কাজকর্ম।

আদর্শ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলা বেশি কার্যকর। এখানে কিছু টিপস দেয়া হলো যা আপনার খাদ্যাভাস পরিবর্তনে কিছুটা সাহায্য করবে।

* আমিষ আমাদের শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আপনি ছোট মাছ, সিদ্ধ মটরশুটি, মাখন তোলা দুধ খেতে পারেন।
* রঙ্গিন শাক-সব্জি, গাজর, পালং, টমেটো, তরমুজ, মলা ও ঢেলা মাছ। মিষ্ট কুমড়া খেতে পারেন তাতে চোখের প্রয়োজনীয় ভিটামিন আপনি পেতে পারেন।
* শরীরের হাড়ের সন্ধিস্থল, স্নায়ুতন্ত্র ও পেশির জন্য ডাল, কলা, মাছ, ননিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
* ভিটামিন 'সি' ত্বকের জন্য জরুরী। চিনিযুক্ত লেবু ও লেবু জাতীয় ফলের রস, টমেটো টাটকা সবুজ কাচা মরিচ, তাছাড়াও টকফল খাবেন। সালাদে প্রচুর লেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন। লেবুকে খাবারের নিত্য সঙ্গী করতে পারেন। এটা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
* আপনি পরিমিত খাবারের অভ্যাস করুন, অল্প অল্প করে নির্দিষ্ট সময়ে ফ্যাটমুক্ত সিদ্ধ খাবারে নিজেকে অভ্যস্ত করুন। এতে শরীর থাকবে তাজা ও রক্তে চিনির মাত্রাও থাকবে ঠিকমতো।
* রান্না করুন সিদ্ধ, বেক, পোচ, বা ঝলসে। তেল, ঘি দিয়ে ভেজে নয়। যত তেল কম দেবেন শরীর ততই ভাল থাকবে।
* রাত ৯ টার মধ্যে খাওয়া শেষ করতে চেষ্টা করুন। এতে শরীর খাবার সঠিকভাবে পরিপাক করার সময় পায়। ফলে শরীরে চর্বিও কম জমে।
* মাঝে মাঝে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। বিশেষ করে প্রেসার ও ওজন দেখুন। চলুন আমরা আমাদের মা, খালা, দাদী, নানীর কথা একটু ভাবি। তাদের সময় কিন্তু আধুনিক মজাদার খাবার খুব একটা ছিল না, তাতে এ ধরনের জটিল রোগও কম ছিল। তারা সারা দিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্তুষ্টচিত্তে পেট ভরে খাবারও পেতেন না। ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গা গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করে যা খেতেন তাই ভাল লাগত। পরিশ্রমের শরীর চৌকিতে গা লাগার সাথে সাথেই ঘুমের রাজ্যে চলে যেতেন। ঘুমের ঔষধের মজাদার গল্প তাদের মুখে ছিল না। মাঠে যা সবজী পেতেন তা দিয়ে অল্প তেল বা কোন সময় তেল ছাড়াই একটা কিছু রান্না করে পার করে দিতেন দিনের সিংহভাগ। খাবারের চিন্তা করবে কখন? হাতের কাজ সারাই ছিল তাদের চিন্তা। আমাদের চালচলন ও খাবারের ধরন পাল্টানো উচিত। কম দামী তাজা সবজীতে প্রচুর পুষ্টিগুণ রয়েছে। যা শরীরের জন্য খুবই দরকারী। অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। মানুষ, সমাজ, দেশ তথা জাতির জন্য কিছু করতে হলেও সুস্থ, সুন্দর দেহ ও মন নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

-ডাঃ পারভীন হাকিম আনোয়ার

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে যাঁরা শোক প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সকলের নিকট মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সকলের ভালবাসা ও সমবেদনা আমাদেরকে অভিভূত করেছে। মরহুম বিগত প্রায় ৪৯ বছর ধরে (আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে) জামাতের নিরলস খেদমত করে গেছেন। তিনি ধর্মকে যাবতীয় পার্থিব বিষয়ের উপর স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সব কিছুর উর্দ্ধে ছিল আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম। আদর্শের জন্য তিনি যে কোন প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করেন নি আর আমৃত্যু তিনি আমাদেরকেও এ বিষয়ে তাগিদ দিয়ে গেছেন। তাঁর অসুস্থতার সময় যারা বিভিন্নভাবে তাঁদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন এবং দোয়া করেছেন আর তাঁর মৃত্যুর পর যারা শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের সকলের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) এর নিকট, তিনি আব্বার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমার আম্মার নিকট এক শোক পত্রে লিখেন, "মরহুম ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে জামাতের খিদমতের কারণে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর আহমদীয়াতের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা আর একনিষ্ঠ সেবা মহান আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করুক। তিনি কলম এবং বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্মের যে খিদমত করেছেন মহান আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে এর উত্তম পুরস্কার দিন" (১১/০৮/২০০৫)। হুযূর (আইঃ) গত ৪ সেপ্টেম্বর জার্মানীতে মরহুমের জানাজায়ে গায়েব আদায় করেন।

আমরা সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি যে, আল্লাহ্ রহমানুর রাহীম যেন মরহুমকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করেন এবং মরহুমের উত্তরসুরীগণ যেন বংশ পরাম্পরায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর আদর্শের ঝান্ডাকে সঠিকভাবে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষে-
আহমদ তবশীর চৌধুরী
মরহুমের পুত্র ও সদর
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

যিকরে খায়ের

মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রত্যেক মানুষের চলনে বলনে নিজস্ব একটা ষ্টাইল আছে। আমার আড়াই বছরের নাতনী জয়ন্তী যখন পরিবারের কাউকে ধমক দেয়, আমি বিস্মিত হই, অন্যদেরকে আমি এ শিশুটিকে কিছু বলতে বারন করি। সে যখন বিশেষ এক ষ্টাইলে হাঁটে, আমার তখন খুব ভাল লাগে আল্লাহ্‌র মহিমা দেখে–এটা তার বংশগত ষ্টাইল। আজকাল বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন–পূর্বপুরুষদের জিন উত্তরসূরিদের দেহে। এটা সত্য যে, পূর্বপুরুষদের আচরণ পরবর্তীদের মাঝে থাকবেই।

এতটা ভূমিকা দিয়ে আজ যার স্মৃতিচারণ করছি, তিনি মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। তিনি ছিলেন এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। পিতৃ ও মাতৃকুল দু'টোই জমিদার –এলাকার লোকদের ভাষায় তোতা মিঞা জমিদার পরিবার। তাই তাঁর ষ্টাইল, পছন্দ-অপছন্দ, আচার-আচরণ আর দশটা সাধারণ মানুষ থেকে আলাঁদা হবে এ আর বিচিত্র কি? যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের কাছাকাছি আসেন, ফলে খ্রীষ্টান হবার পথ ধরছিলেন প্রায়। এরই মাঝে আহমদীয়াতের, কিছু পুস্তকাদি পেলেন। ঝুঁকে গেলেন গভীর মনোযোগের সাথে। খ্রীষ্টধর্মের চিন্তা থেকে আহমদীয়াতের দিকে তিনি বেশি মনোযোগী হলেন। ১৯৫৭ সনের কোন এক দিনে এ তরুন কবুল করলেন আহমদীয়াত।

মরহুম চৌধুরী আহমদ তৌফিক ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা চেয়েছিলেন পুত্র একজন আইনবিধ হবে। কিন্তু বিধাতা তাঁকে করেছিলেন ইসলাম ধর্মের সেবক, গবেষক। বৃটেনের এক রাজা রাজসিংহাসন ছেড়ে ছিলেন এক নারীর প্রেমে মজে–আর আহমদ তৌফিক বঞ্চিত হয়েছিলেন পিতার সম্পদ থেকে আহদীয়াত কবুলের অপরাধে। আহদীয়া জামাতের তখনকার কতিপয় বুযুর্গ আলেম-ওলামা চৌধুরী সাহেবের পৈত্রিক বাড়ী সেলবরষের 'বীর' গ্রামে গেছেন– তাঁর দাওয়াতে। পিতা মেহমানদের যেমন অমর্যাদা করেন নি, তেমনি তাদের এহেন যাতায়াতকেও ভাল দৃষ্টিতে দেখেন নি।আহমদীয়াত কবুলের পর নিকটাত্মীয়ের চরম অসহযোগিতা ও এলাকার বিরোধিতার ফলে পিতৃনিবাস সেলবরষ থেকে স্ত্রী সন্তানকে সাথে নিয়ে ময়মনসিংহ শহরে হিজরত করলেন। এ শহরে তখন এক উচ্চ পরিবারে তাঁর এক বোন ছিলেন।

১৯৬৩ সালে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। আমি সে বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বয়াত করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। মরহুম চৌধুরী তখন পূর্ব পাকিস্তান মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার 'রিজিওনাল কায়েদ'। তখন পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশে পাঁচজন 'রিজিওনাল কায়েদ' খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠনের প্রধান ছিলেন। সে বছর (১৯৬৩) নভেম্বর মাসে তাঁর নিগরানীতে ব্রহ্মণবাড়ীয়া শহরের লোকনাথ ট্যাংকের পাড়ের মাঠটিতে তাবু খাঁটিয়ে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা। তখন তাঁর খুব কাছাকাছি থাকার সুযোগে তাঁকে দেখেছি। আহমদীয়াতের উপর তাঁর প্রচুর গবেষণামূলক পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে। খৃষ্টধর্ম নিয়ে তিনি অনেক ঘাটাঘাটি করেছেন। খৃষ্টধর্মের অসারতাও তিনি প্রমাণ করেছেন। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি প্রচুর লেখা-পড়া করেছিলেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ বেদ, গীতা, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ চষে বেড়িছেন। গবেষণা করে তিনি আস্বস্ত হয়েছিলেন যে, সনাতন ধর্মের প্রবর্তক শ্রী কৃষ্ণ একজন সত্য নবী ছিলেন। তাঁর অনুসারীরা পরবর্তীতে একেশ্বরবাদ থেকে মূর্তিপূজক হয়েছে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গবেষণার দিনগুলিতে তিনি প্রায়ই বলতেন তিনি সিলেটের রাঢ় অঞ্চলের রাজা গোবর্ধনের বংশধর বা অধঃস্তন পুরুষ। কাজেই, তাঁর পূর্ব পুরুষের ধর্ম সম্বন্ধে জানা ও গবেষণা তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল। এ সময়ে তিনি বলতেন –আমি শ্রী কৃষ্ণের প্রেমে পড়ে গেছি। অনেক সময় কিছু কিছু লোক তাঁর এসব গবেষণার সময় তাঁর বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু গবেষণা কাজে তিনি কখনো পিছপা হন নি। তিনি হিন্দু ধর্মের উপরও কিছু পুস্তিকা রচনা করে গেছেন। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, খেলাফত, খৃষ্ট ধর্ম, বাহাই ধর্ম সম্পর্কে ছোট ছোট পুস্তিকা লিখে গেছেন। তাঁর পুস্তিকাগুলোতে সুন্দর সুন্দর অনেক ফারসী উদ্ধৃতি তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় বহণ করে। মরহুমের রচনাসমগ্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ।

মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবকে আমি খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মকর্তা সেলবরষ ও ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট, 'ঋতুপত্র' ও 'আলমিনার' পত্রিকার সম্পাদক, ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তা, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একজন সেক্রেটারী হিসেবে দেখেছি। পরবর্তীতে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর এবং পরবর্তীতে ন্যাশনাল আমীরও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী, গবেষক, মানুষের হৃদয় জয় করা বক্তা। তিনি রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতেন ফলে তাঁর যুক্তিগুলো ছিল পছন্দনীয়। সালানা জলসায় মরহুম চৌধুরী সাহেবের বক্তৃতা না থাকলে জলসার কর্মসূচীটাই কেমন জানি শূন্য মনে হতো।

মোহতারম চৌধুরী সাহেবকে আমি সত্তর এর দশকে ভারতের কোলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনেও ইসলাম ধর্মের উপর বক্তৃতা দিতে দেখেছি। কোলকাতার 'সর্বধর্ম সম্মেলনে' স্বল্প সময়ে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় তিনি এত সুন্দরভাবে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য উপস্থাপন করেন যে, তাতে সে দেশের হিন্দু পন্ডিতরা ইসলাম যে সন্ত্রাসের নয় শান্তির ধর্ম–একথা উপলব্ধি করেছেন নতুন করে। তাদের কাছে তাঁর বক্তৃতা খুবই আকর্ষণীয় ছিল। তিনি পশ্চিমবঙ্গের আহমদীয়া জামাত কোলকাতার পক্ষ থেকে সেখানকার বহু এলাকায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে মানুষের মন জয় করে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বর্তমান আমীর বন্ধু মোহতারম মোহাম্মদ মাশরেক আলী বলেন, কোলকাতা জামাতে আলহাজ্ব চৌধুরী সাহেরের অনেক ভক্ত রয়েছে। বহু বছর ধরে, যতদিন তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল, প্রতি বছরই তিনি পশ্চিমবঙ্গ সফর করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিভিন্ন জলসায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি ভারতের আন্দামান দ্বীপেও বক্তৃতা করেছেন।

বাংলাদেশ হওয়ার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যত সালানা জলসা হয়েছে, তার সবটাতে তিনি বিশেষ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। এক সময়ে তাঁর বক্তৃতা নিয়েও জলসার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া তিনি জীবনে জামাতের কাজ করতে গিয়ে কয়েকবারই চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়েও দিনাতিপাত করেছেন। ধৈর্য ও দোয়ার সাথে এসবের মোকাবেলা করেছেন বলে তিনি আমাকে বলেছেন। কারো কারো মতে, মরহুম চৌধুরী সাহেব একগুঁয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। একথাটার সত্যমিথ্যা আমার কাছে বিবেচ্য নয়, কেননা শুরুতেই আমি বলেছি, যে পরিবেশে তাঁর জন্ম অন্য আর দশটা মানুষ সে পরিবেশ পায়নি। তাদের কাছে মরহুম চৌধুরী সাহেবের স্বভাব ধরন নিয়ে প্রশ্নটা উঠতেই পারে। তিনি পুরো জীবনে কারো অধীনে চাকুরী করেন নি। আমাদের বর্তমান সমাজে অফিস আদালতে বসদেরকে অধঃস্তনরা যেমন করে তোয়াজ করে মরহুম চৌধুরী সাহেবের চরিত্রে তা' ছিল অনুপস্থিত। এ আচরণে কিছু কিছু মানুষ তাঁকে কঠিনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি একজন ফরমাবরদার ও নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তিনি ওয়াকফে জিন্দেগী ও একজন ওসীয়্যতকারী (মুসী) ছিলেন। মরহুম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব তাঁর সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ওসীয়্যত করে তার হিস্যা পরিশোধ করে গেছেন। নিজের বোঝা পরবর্তী বংশধরদের মাথার উপর চাপাতে চান নি বলে তা' নিজেই শোধ করে গেছেন আর নিশ্চিত করে গেছেন মৃত্যু পরবর্তী 'বেহেশ্‌তী মকবেরা' তে তাঁর স্মৃতি ফলকের অধিকারটুকু। হঠাৎ করেই গত ১০ই আগষ্ট ২০০৫ইং তারিখে তাঁর সুখ-দুঃখের, সারা জীবনের সাথী বিধবা স্ত্রী, এক সুযোগ্য পুত্র, তিন কন্যা ও অনেক গুণগ্রাহীকে রেখে চলে গেছেন পরপারে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সকল গবেষণা আমাদের মাঝে জিইয়ে রাখুন –জান্নাতের উচ্চ মোকামে তাঁকে স্থান দিন এ আমাদের প্রার্থনা।

–এ, কে রেজাউল করীম

কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোযা

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রোযা অন্যতম একটি। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন বলে "হে লোক সকল যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা-(আযাব হতে) রক্ষা পাও।"

অতঃপর রোযা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন, "অতএব তোমরা রোযা রাখ কতিপয় গণনার দিন এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত ও সফরে থাকে। তবে অন্য দিনে সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। এবং ঐ সমস্ত লোকদের যারা এর (রমযানের ফিদিয়ার) শক্তি রাখে ;এক মিছকিনের খোরাকী দেওয়া ওয়াজিব। এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্যের সহিত কোন নেক কাজ করবে এটা তার জন্য উৎকৃষ্ট হবে যদি তোমরা জ্ঞান রাখো। উপলব্ধি করতে পার যে, তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট।" সুতরাং উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, রোযা সর্বপ্রথম মুসলমানগণের প্রতিই ফরয করা হয় নি বরং পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয ছিল। এ ছাড়া রোযা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক মহা ঔষধ। যারা নিষ্ঠার সাথে রোযা পালন করে তারা আধ্যাত্মিক চারিত্রিক দুর্বলতা হতে রক্ষা পায়। এখানে একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য যে রমযান মাসে যারা পীড়িত থাকে বা সফরে থাকে তাদেরকে দিন গণনার কথা বলা হয়েছে রোযা রাখার কথা বলা হয় নি। সুতরাং এতে প্রমাণ হয় যে, এ উভয় অবস্থায়ই রোযা বাদ দিয়ে দিনের হিসাব রাখতে হবে যেন আরোগ্য লাভের পর বা সফর হতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর –ঐ দিনগুলো পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এখনও এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও রোযা রাখে এবং সফর অবস্থায়ও তদ্রুপ করে।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রোযা যেরূপ খোদাতাআলার আদেশ সেরূপ উপরোক্ত কারণ বিদ্যমান থাকলে দিনের হিসাব রাখাও খোদাতাআলার আদেশ। সুতরাং খোদাতাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না।

এ বিষয়ে হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আদম সন্তানদের আমল তার নিজের জন্য কিন্তু রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান স্বয়ং আমি। রোযা মু'মিনের ঢাল স্বরূপ" "যদি তোমাদের কেউ রোয়াদার হয় তবে অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা ঝগড়া করতে চায় তবে বলবে আমি রোযাদার। ঐ অস্তিত্বের শফথ যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রাণ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌তাআলার নিকট কস্তুরির গন্ধের চেয়েও অধিক সুগন্ধ। রোযাদারের জন্য দুই প্রকার আনন্দ। প্রথমতঃ যখন তারা ইফতার করে এবং দ্বিতীয়তঃ যখন তারা সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত করে। (বুখারী শরীফ)

রোযা সম্পর্কে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে "যেদিন চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে ঐ দিন যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে নবী করীম (সঃ)এর অবাধ্য।"

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন, "আমাদের এবং আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে প্রভেদ সেহরী খাওয়া। (মুসলিম শরীফ)

হযরত জায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমরা রসূল করীম (সঃ)-এর সহিত সেহরী খেলাম অতঃপর নামাযে দাঁড়ালাম। এর মধ্যে প্রভেদ ছিল ৫০ আয়াত পাঠ করার সময়।(বুখারী, মুসলিম)।

রসূল (সঃ) আরো বলেন, "মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমার বেশি প্রিয় যে ব্যক্তি খুব শীঘ্র ইফতার করে।" (তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, রোযা রাখার পুরস্কার আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং নিজেই। রোযা ঢালস্বরূপ সব আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করে, এমন অনেক ব্যক্তি আছে চাঁদ উঠার পূর্বেই আন্দাজের উপর বা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করার জন্য রোযা রাখে এ সকল লোকদিগকে রসূল (সঃ) নাফরমান আখ্যা দিয়েছেন।

কিছু ব্যক্তি এমন আছে, যারা অধিক রাত্রে সেহরী খায় এই অভ্যাস রসূল (সঃ)-এর নির্দেশের খেলাফ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত লোক ফজরের নামায কাযা করে। সুতরাং সেহরী খাওয়াতে যেরূপ শেষ সময়ে খাওয়ার তাগিদ রয়েছে তদ্রুপ ইফতার করার বেলায় শীঘ্রই করার তাগিদ আছে। এবং সময় হওয়া মাত্র ইফতারকারীকে আঁ-হযরত (সঃ) সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি বলে সম্বোধন করেছেন।

অতএব পবিত্র কুরআন ও হাদীসে প্রণীত দিক নির্দেশনার মাধ্যমেই খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। আর সে লক্ষ্যেই আমাদের আমল করা উচিত। সুতরাং সকল আদেশ নিষেধ পালন করে রোযা রাখার মধ্যে খোদাতাআলার নৈকট্য ও পুরস্কার নিহিত।

–ইনশান আলী টুটুল

তাহ্‌রীকে জাদীদের গুরুত্ব

তাহ্‌রীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল-মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর বক্তব্যের আলোকে মালেক মনওয়ার আহমদ জাবেদ, কায়েদে-ইশায়াত, মজলিস আনসারুল্লাহ্ রাবওয়াহ।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন**।

১। তাহ্‌রীকে জাদীদ কি?

"জগতের সকল মানুষের নিকট পয়গাম পৌঁছানোর জন্য আমাদের লোকের প্রয়োজন, আমাদের টাকার প্রয়োজন, আমাদের ইচ্ছা ও ধৈর্য প্রয়োজন, আমাদের দোয়ার প্রয়োজন, মোটকথা, যা খোদার আরশকে প্রকম্পিত করে দিবে সেই জিনিসের নাম তাহ্‌রীকে জাদীদ।" (দৈনিক আল ফযল, খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা- ২৮০)।

২। তাহ্‌রীকে জাদীদ কেন চালু করা হয়েছে?

"তাহ্‌রীকে জাদীদ এ জন্য চালু করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমাদের কাছে ঐ পরিমাণ টাকা সঞ্চিত হয়, যা দ্বারা খোদাতাআলার নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সহজ ও স্বাচ্ছন্দে পৌঁছানো যায়। তাহ্‌রীকে জাদীদ এ জন্য চালু করা হয়েছে যেন কিছু লোক স্বেচ্ছায় খোদার ধর্মের প্রচারের জন্য নিজেদের ওয়াক্‌ফ করবে এবং সারা জীবন ঐ কাজে লেগে থাকবে। তাহ্‌রীকে জাদীদ এ জন্য চালু করা হয়েছে যেন ঐ দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য আমাদের জামাতে সৃষ্টি হয় যা কর্মঠ জামাতে সৃষ্টি হওয়া জরুরী"। (খুতবা জুমুআ ২৭ নভেম্বর, ১৯৪৬ সন, আল ফযল, খন্ড ৩০, পৃষ্ঠা-২৮০)।

৩। তাহ্‌রীকে জাদীদে অংশ গ্রহণ কেন জরুরী?

ক) "আমি মনে করি প্রত্যেক এমন ব্যক্তি (আহমদী) যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ঈমান রয়েছে সে আমার এ তাহ্‌রীকের দিকে অগ্রসর হবে। আর ঐ ব্যক্তি যে খোদাতাআলার প্রতিনিধির আহ্বানে কান দেয় না তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।" (খুতবা জুমুআ, প্রদত্ত ৯ নভেম্বর ১৯৩৪ইং)।

খ) "কোন জামাতকে ঐ বিষয়ের উপর প্রশান্তি লাভ করা উচিৎ নয় যে, তারা তাহ্‌রীকে জাদীদে অংশ গ্রহণ করেছে বরং তাকে (জামাতে) ঐ সময় পর্যন্ত প্রশান্তির নিঃশ্বাস নেয়া উচিৎ নয় যে পর্যন্ত না তাদের জামাতের সকল সদস্য এতে অংশ গ্রহণ করে"। (খুতবা জুমুআ, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৭ইং)

৪। তাহ্‌রীকে জাদীদ একটি স্থায়ী তাহ্‌রীকঃ

"তাহ্‌রীকে জাদীদের নাম ঐ স্থায়ী তাহ্‌রীকগুলোর মধ্য থেকে যাতে অংশ গ্রহণকারীরা আল্লাহ্‌তাআলার ফযল (কল্যাণ) সমূহের অধিকারী হবে।" (খুতবা জুমুআ, ৮ই নভেম্বর ১৯৩৮ইং আল ফযল, খন্ড ২৬, পৃষ্ঠা-২৭১)।

৫। তাহ্‌রীকে জাদীদ একটি ঐশী তাহ্‌রীক ঃ

"আমার চিন্তায় এ তাহ্‌রীক মোটেও ছিলনা। হঠাৎ এ তাহ্‌রীক আল্লাহ্‌তাআলা আমার হৃদয়ে নাযেল করেছেন। সুতরাং ইহা ছাড়া আমি অন্য কোন ধরনের ভুল বর্ণনা দিয়ে পাপ করতে পারিনা। আমি বলতে পারি এ তাহ্‌রীকে জাদীদ খোদাতাআলা চালু করেছেন। প্রথমে আমার চিন্তায় এ তাহ্‌রীক মোটেও ছিলনা। আমার চিন্তা এটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তাআলা এ স্কীম আমার হৃদয়ে নাযেল করেছেন আর আমি এটাকে জামাতের সামনে উপস্থাপন করেছি। সুতরাং এটা খোদাতাআলার নাযেলকৃত তাহ্‌রীক"। (খুতবা জুমুআ ২৭ নভেম্বর, আল ফযল, খন্ড ৩০, পৃঃ ২৮০) তিনি আরো বলেন- 'আমি আল্লাহ্‌তাআলার কাছে এই তাহ্‌রীককে পরিপূর্ণতার জন্য সোপর্দ করেছি। এ কাজ তাঁরই আর আমি হচ্ছি এক নগন্য খাদেম। শব্দ আমার কিন্তু আদেশ তাঁর।(খুতবা জুমুআ ১৫ নভেম্বর, ১৯৩৫ইং)।

৬। তাহ্‌রীকে জাদীদের লক্ষনীয় বিষয় ঃ

'দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান) ও তা'লীম তরবিয়ত দুটি খুবই গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। আর এই দুটি কাজকে তাহ্‌রীকে জাদীদে লক্ষ্যবস্তু রাখা হয়েছে। তালীম ও তরবিয়তকে লক্ষ্য রেখেই সাদাসিধে খাবার, সাদাসিধে পোশাক, নিজের হাতে কাজ করা, সিনেমা বর্জন, গরীবদের সাহায্য, তাহ্‌রীকে জাদীদের বোর্ডিং, উত্তরাধিকারের সম্পত্তি ইত্যাদি কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এই সব বিষয় এমন যা কখনও পরিত্যাগ করা যাবে না। (খুতবা জুমুআ ১৮ নভেম্বর, ১৯৩৮ইং আল ফযল, খন্ড ২৬/২৭১)।

৭। তাহ্‌রীকে জাদীদের মুতালেবাতের (দাবীসমূহ) সারমর্ম ঃ

এই মুতালেবাতের সারসংক্ষেপ চারটি বিষয় ঃ

১। প্রথমতঃ জামাতের সদস্যদের মাঝে আমলী জিন্দেগী (কর্মমুখী জীবন) সৃষ্টি করা, বিশেষ করে যুবকদের মাঝে সচেতনতা ও কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২। দ্বিতীয়তঃ জামাতী কর্মকান্ডের ভিত্তিকে আর্থিক কুরবানী ছাড়াও ব্যক্তিগত কুরবানীর উপর রাখা হয়েছে।

৩। তৃতীয়তঃ জামাতের মধ্যে তাহ্‌রীকে জাদীদের এমন এক কান্ড সৃষ্টি করা যার ফলে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজের জন্য আর্থিক সমস্যা বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

৪। চতুর্থতঃ জামাতকে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজে পূর্বের চেয়ে বেশি মনোযোগী করা।

(রিপোর্ট মজলিসে মুশাবেরা, এপ্রিল ১৯৩৯ইং, পৃঃ ৩)। তিনি (রাঃ) আরও বলেন-" তাহ্‌রীকে জাদীদের সমস্ত মুতালেবাত এ জন্য যে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর প্রকাশস্থল বানাও। কোন মানুষ কোন বুদ্ধিমান মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে না। তাই তোমরা কিভাবে মনে করতে পার যে, তোমরা খোদাতাআলাকে ধোঁকা দিতে পারবে। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই আমি তাহ্‌রীকে জাদীদের সূচনা করেছি। (আল-ফযল খন্ড ২৫/২৮৩)

৮। তাহ্‌রীকে জাদীদের কর্মকর্তাগণ ঃ

'খোদাতাআলার কাজ জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদের উপর ন্যাস্ত নয়। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তাআলা কোন জামাতকে এটা জিজ্ঞেস করবেন না যে, তোমাদের প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী কেমন ছিলো? বরং তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি কেমন ছিলে? যদি কোন জামাতের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী দুর্বল হয়, আর তার দুর্বলতার কারণে জামাতের সদস্যরা তাহ্‌রীকে জাদীদের অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। বরং বলা হবে তোমাদের প্রত্যেকে সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট ছিলো আর তোমাদের ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ছিল যখন কোন প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী দুর্বলতা দেখাচ্ছিল তখন তোমরা নিজেরাই তাদের জায়গায় কাজ করতে..... কোন জামাতকে ঐ বিষয়ের উপর প্রশান্তি লাভ করা উচিৎ নয় যে, তারা তাহ্‌রীকে জাদীদে অংশ গ্রহণ করেছে। বরং তাদেরকে ঐ সময় পর্যন্ত প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলা উচিৎ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে সমগ্র জামাত অংশ গ্রহণ না করে। (খুতবা জুমুআ ১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৭)।

প্রচারণায়

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহ্‌রীকে জাদীদ

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নেতৃবৃন্দের বিবৃতির আলোকে
খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আসল চেহারা

প্রথম আলো

শুক্রবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫, ২৫ ভাদ্র ১৪১২

পরস্পরকে ভারতের দালাল বললেন নূরানী-মমতাজী

নিজস্ব প্রতিবেদক

আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলন স্থগিত ঘোষণার্থক সংবাদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের দু শীর্ষ নেতা মাওলানা মমতাজী ও মুফতি নূরানী একে অন্যকে ভারতের দালাল ও 'র'-এর এজেন্ট বলে গালাগাল করেছেন।

সংগঠনের নায়েবে আমির মুফতি নূর হোসাইন নূরানী গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে সারা দেশে বোমা হামলার পর বর্তমান পরিস্থিতিকে জাতীয় সংকট হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, 'এ পরিস্থিতিতে কাদিয়ানি (আহমদিয়া) ইস্যুতে আন্দোলন চলতে থাকলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ নতুন কোনো সমস্যায় সম্মুখীন হতে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পরস্পরকে ভারতের দালাল বললেন নূরানী-মমতাজী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারে; তাই ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচিসহ কাদিয়ানিবিরোধী সব কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করছি।'

সংবাদ সম্মেলন শেষ হওয়ার তিন-চার মিনিটের মধ্যে সংগঠনের আমির মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলে সংবাদ সম্মেলনস্থলে এসে হাজির হন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনারা যাবেন না। আবার সংবাদ সম্মেলন হবে। তার আগে বলেন, নূরানী কোথায়?'

মুফতি নূরানী তখন পাশের কক্ষে স্যাপ খাচ্ছিলেন। মাওলানা মমতাজী সংগঠনের অন্য নেতা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে নূর হোসাইন নূরানীর খাওয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে [illegible] কোন ক্ষমতায় আপনি সংবাদ [illegible]?

নূরানী প্রথমে একটু ভড়কে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'মুফতি নূর হোসাইন নূরানী নিজেই ক্ষমতা, সে কারো কোনো ক্ষমতার তোয়াক্কা করে না।'

এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে মমতাজী বলেন, "সাংবাদিক ভাইয়েরা, নোট করুন- নূরানী ভারতের দালাল, 'র'-এর এজেন্ট। সে 'র' থেকে টাকা খেয়েছে। আমাদের কাছে এর প্রমাণ আছে। সে কাদিয়ানিবিরোধী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছে।"

মুহূর্তেই হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নূরানী, "কে বলে আমি ভারতের দালাল? আমাকে যারা ভারতের দালাল বলে, তারাই 'র'-এর এজেন্ট। ভারত এ দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। আর আমি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যাতে না হয়, তার জন্য কাদিয়ানিবিরোধী কর্মসূচি স্থগিত করেছি।"

মমতাজী একটু সরে গিয়ে পাশের টেবিলে বসে সাংবাদিকদের বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে নূরানীর গতিবিধি সন্দেহজনক দেখছিলাম। তাকে সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর বহিষ্কার করা হয়েছে। তার আজকের সংবাদ সম্মেলন সম্পূর্ণ অবৈধ।'

নূরানী টেবিল ছেড়ে তেড়ে গেলেন মমতাজীর দিকে। বললেন, 'বাংলার জমিনে এমন কোনো বাপের বেটা নাই, যে আমাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে পারে। আই ওয়ান্ট টু সি, হু ইজ দ্যাট ম্যান- যে আমাকে বহিষ্কার করতে পারে। আমি রাজনীতি করি, তাই রাজনীতির ভাষায় কথা বলছি। না হলে এখন খেলা দেখতেন মুফতি নূরানী কী।'

তর্কাতর্কির এ পর্যায়ে হাতাহাতির উপক্রম হলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক দুজনের মাঝে এসে দাঁড়ান। দুজনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন- 'এখানে মিডিয়া আছে। আপনারা আমজনতার সামনে এসব কেন করছেন? চলেন, ঘরে বসে আলোচনা করে এর সমাধান করি।'

সংবাদ সম্মেলন শেষে খাওয়ার কক্ষে দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার এই বাগবিতণ্ডা শেষে নূরানী উচ্চৈঃস্বরে [illegible] 'আগামী দু-[illegible] আমি আবার সংবাদ সম্মেলন করে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে মমতাজী পাল্টা ঘোষণা দেন, 'সংবাদ সম্মেলন করার সে কে? সংবাদ সম্মেলন করব আমরা।'

এর আগে সংবাদ সম্মেলনে মুফতি নূরানী বলেন, বোমা হামলা করে যারা দেশ ও জাতির সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছে, তারা দেশ-জাতি ও ইসলামের শত্রু।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতি করি। আমি আমার দলের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বশীল। আমার এলাকা মুন্সিগঞ্জে কোনো বোমা ফাটেনি। আমি সেখানে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছি। কদিন আগে সেখানে আমি কাদিয়ানিবিরোধী বিশাল মিছিল করতে যাই। তখন প্রশাসনের লোকজন যখন বললেন, আমাদের এলাকার সুনামটা রাখুন। আমি মিছিল কর্মসূচি স্থগিত করেছি।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মুফতি নূরানী বলেন, 'জামাআতুল মুজাহিদিন, শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাই অবশ্যই দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রু। আমার দাবি, বোমা হামলার জন্য যারা দায়ী, তাদের ৬৩ জেলার নিজ নিজ স্পটে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে হবে।'

দৈনিক জনকণ্ঠ

আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন থেকে সরে আসছে খতমে নবুওয়াত!

[illegible]

আহমদীয়াদের অমুসলিম

[illegible]

আমার দেশ

ঢাকা, শুক্রবার ● ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫
২৫ ভাদ্র ১৪১২ ● ৪ শাবান ১৪২৬

কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন স্থগিত

[illegible]

সমকাল

সোমবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫

নূরানী ও মমতাজী নিয়ে ইশা আন্দোলন বিব্রত

সমকাল প্রতিবেদক

[illegible]

…বার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ প্রথম আলো

শাসনতন্ত্র আন্দোলন থেকে মুফতি নূরানী পদত্যাগ করেছেন

কাদিয়ানিবিরোধী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি নূর হোসাইন নূরানী ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের (ইশা) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থেকে পদত্যাগ করেছেন।

তিনি গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'বেশ কয়েক দিন ধরে খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের চরম বিতর্কিত আমির, অর্থ আত্মসাৎকারী মাওলানা মমতাজী অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তার অপকর্ম দেশের নিরীহ মুসলমানদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে জড়িয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বানোয়াট খবর প্রকাশ করে চলছে। পাশাপাশি ইশা আন্দোলনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।'

মুফতি নূরানী বলেন, 'মাওলানা মমতাজীর অর্থ আত্মসাৎ, খতমে নবুওয়ত ব্যবসা ও বিভিন্ন অপকর্ম বিষয়ে যা ঘটেছে, তার দায়দায়িত্ব কিছুতেই ইশা আন্দোলনের হতে পারে না।'

প্রথম আলো

সোমবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫, ৪ আশ্বিন ১৪১২

খতমে নবুওয়ত আন্দোলন নিয়ে মুখোমুখি নূরানী-মমতাজী

নিজস্ব প্রতিবেদক

আহমদিয়াবিরোধী কট্টরপন্থি সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল খতমে-নবুওয়ত মুভমেন্টের শীর্ষ দু নেতা মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী ও মুফতি নূর হোসাইন নূরানীর দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলন বা 'কথিত' খতমে নবুওয়ত ব্যবসার' অর্থ আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাংবাদ সম্মেলন, বহিষ্কার, পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পর এবার দৃশ্যপটে এসেছে দুজনেরই মূল রাজনৈতিক সংগঠন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (ইশা)।

…ল রোববার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির

…ষ্ঠা ২ কলাম ৬

আন্দোলন নিয়ে মুখোমুখি নূরানী-মমতাজী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজের অপরাধে ইশা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির পদ থেকে মুফতি নূরানীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শনিবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এর আগে গত শনিবার রাতেই নূরানী এক বিবৃতিতে ইশা আন্দোলন থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে মুফতি নূরানী বলেন, বেশ কয়েক দিন ধরে ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের চরম বিতর্কিত আমির মাওলানা মমতাজী অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অর্থ আত্মসাৎ, খতমে নবুওয়ত ব্যবসা ও বিভিন্ন অপকর্ম করে আসছেন। তার এসব অপকর্ম থেকে নিরীহ মুসলমানদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে জড়িয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বানোয়াট খবর প্রকাশ করে চলছেন। পাশাপাশি ইশা আন্দোলনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন। তাই ইশা আন্দোলনকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে আমি পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।

তবে নূরানী খতমে নবুওয়াত মুভমেন্টের সিনিয়র নায়েবে আমির পদ থেকে এখনো পদত্যাগ করেননি। যদিও এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলে নূরানী আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন শেষে মাওলানা মমতাজী সাংবাদিকদের সামনেই নূরানীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন এবং নূরানীকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। ওই সময় দুজনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল।

এ ব্যাপারে মুফতি নূরানী বলেছেন, বাংলার বুকে এমন কোনো মায়ের সন্তান নেই যে তাকে খতমে নবুওয়ত থেকে বহিষ্কার করতে পারে।

তিনি বলেন, মাওলানা মমতাজী খতমে নবুওয়তের 'কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলনের' নামে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

মাওলানা মমতাজী পাল্টা অভিযোগ এনেছেন নূরানীর বিরুদ্ধে। মমতাজী বলেছেন, মুফতি নূরানী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর এজেন্ট। টাকা খেয়ে কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছেন। এর প্রমাণও আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আসা টাকা নিয়ে বিরোধের জের ধরে সংগঠনের দু শীর্ষ নেতা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন। তবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সবাই মাওলানা মমতাজীর পক্ষে থাকায় নূরানী একা হয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া ইশা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা মমতাজীর নিকট… হওয়ায় এ যাত্রায় মমতাজী এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা সোমবার, ২৮ ভাদ্র ১৪১২, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫

মুফতী নূর হোসেন নূরানীর কাদিয়ানী কানেকশন উন্মোচিত হয়েছে
—খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়াত মুভমেন্টের আমীর মাহমুদুল হাসান মমতাজী বলেছেন, আহমদীয়া জামায়াতের অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে মুফতী নূর হোসেন নূরানীর গোপন কাদিয়ানী কানেকশন উন্মোচিত হয়েছে। গতকাল (রবিবার) প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট থেকে সম্প্রতি বহিষ্কৃত নেতা মুফতী নূর হোসেন নূরানী কাদিয়ানীদের অর্থানুকূল্যে বিভ্রান্ত হয়ে একক সিদ্ধান্তে খতমে নবুওয়ত আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। তার এ ঘোষণাকে বাংলাদেশ আহমদীয়া আন্দোলনের সিনিয়র কমান্ড মাহমুদ আহমদ পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সুতরাং এতেই প্রমাণিত হয় মুফতী নূরানী তার এলাকা থেকে আগামীতে নির্বাচন করার যে ইচ্ছা পোষণ করতেন সে লক্ষ্যে তিনি কাদিয়ানী অর্থেপুষ্ট হয়েছেন। কাদিয়ানী আন্দোলন স্থগিত করার মূল রহস্য এখানেই নিহিত। এমতাবস্থায় শেষ নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এবং কাদিয়ানীদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় তার

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ২৫ ভাদ্র ১৪১২
Dhaka : Friday 9 September 2005

খতমে নবুয়ত ভেঙে গেছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশব্যাপী আহমদিয়া সম্প্রদায়বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট বাংলাদেশ ভেঙে গেছে। নেতৃত্বের কোন্দল ও একে অপরের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনাকে কেন্দ্র করে ছবি এ সংগঠনটি ভেঙে যায়।

নবুয়ত : (পৃ: ১১ ক: ২)

নবুয়ত : ভেঙে গেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে সংগঠনের একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনের আমির মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী। অন্য অংশের নেতৃত্বে আছেন সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি নূর হোসাইন নূরানী।

আমির মুফতি নূর হোসাইন নূরানী গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মমতাজী ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মমতাজী, আলহাজ মুহাম্মদ নাজমুল হক, মাওলানা … আমিনসহ কিছু নেতা সংগঠনকে কুক্ষিগত করেছে। তারা আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মেরেছে।

অন্যদিকে … উপস্থিত সভায় মমতাজী ও তার অনুসারীরা বলেন, খতমে নবুয়তের ব্যানারে নূর হোসাইন নূরানীর

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা, বুধবার ৩০ ভাদ্র ১৪১২, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫

খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের সাথে ইশা আন্দোলনের সম্পর্ক নেই
নূরানীর বক্তব্য বিভ্রান্তিমূলক
—ইশা আন্দোলন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী গতকাল (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে বলেছেন, মাওলানা মাহমুদুল হাসান মোমতাজী ও মুফতী নূর হোসাইন নূরানীর নেতৃত্বাধীন ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের সাথে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, মুফতী নূর হোসাইন নূরানী গত ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনকে খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের মূল শক্তি দাবী করে যে বিবৃতিতে দিয়েছেন তা … কল্পিত ও ভিত্তিহীন। মুফতী নূর হোসাইন নূরানীর এহেন হটকারী ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসী ও সংগঠনের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের প্রতি বিশেষভাবে আহবান জানিয়েছেন।

খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের গোপন তথ্য দেশবাসীকে জানানো হবে
—মুফতী নূরানী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের বহিষ্কৃত নেতা ও ইশা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা মুফতী নূর হোসাইন নূরানী, খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আমীর মাহমুদুল হাসান মমতাজী কর্তৃক তার সম্পর্কে মিথ্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। গত সোমবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মমতাজীর নবুওয়ত মুভমেন্টের ব্যবসার সকল গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়ায় তিনি বেসামাল হয়ে পাগলের প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, জাতিকে জানাতে মমতাজীকে তার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান পেশ করতে হবে। অন্যথায় খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের সকল গোপন তথ্য দেশবাসীকে জানানো হবে। তাছাড়া খতমে মুভমেন্টের যেহেতু কোন সাংগঠনিক বৈধতা নেই সেহেতু সংগঠনের আমীর হিসেবে তাঁর বৈধতা থাকে কোথায়?

আসন্ন রমযান মাস উপলক্ষে সার্বিক তরবিয়তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জরুরী সার্কুলার

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সদয় অনুমোদনক্রমে আসন্ন রমযান মাস উপলক্ষে আপনাদের খেদমতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি

প্রত্যেক জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদে/হালকা মসজিদে বা নামাযের জন্য নির্ধারিত জায়গায় নিয়মিত বাজামাত ওয়াক্তি নামায, তারাবিহ্ নামায ও দরসে কুরআনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মসজিদ বা নির্ধারিত নামাযের স্থান যাদের বাড়ী থেকে দূরে তারা নিজেদের বাড়ীতেই পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে আন্তরিক হোন।

প্রত্যেকেই যেন কুরআন তেলাওয়াত (সম্ভব হলে অর্থসহ) ও নিয়মিত নামাযে তাহাজ্জুদের প্রতি সচেষ্ট হন। চেষ্টা করুন আসন্ন রমযানে সবাই যেন অন্ততঃ একবার কুরআন মজীদ (তেলাওয়াত) খতম করেন। সে বিষয়ে উদ্যোগ নিন এবং নিয়মিত নিগ্রানী করুন।

জামাতের যেসব সদস্য/সদস্যা কুরআন নাযেরা জানেন না তাদের জন্য আসন্ন রমযান মাসে কুরআন শিক্ষার বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

২০ রমযানের মধ্যে তাহ্রীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা আদায় করুন। যাতে করে হুযূর আনওয়ার (আই:)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য নামের তালিকা পাঠানো যায়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাকে উপরোক্ত চাঁদায় শামিল করুন। **যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তারাও যেন সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেকের নামে চাঁদা আদায় করেন।**

রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফের ব্যবস্থা করুন। এছাড়াও এ বরকতময় মাসে মসজিদ সর্বদা ইবাদত ও যিকরে ইলাহীতে ভরপুর রাখুন।

যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন।

এ বছর শহরের জামাতের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ৮৫০/ (আটশ পঞ্চাশ) টাকা এবং গ্রামের জামাতের জন্য ফিদিয়ার হার নূন্যতম ৬০০/= (ছয়শ) টাকা। ***যারা সামর্থ্যবান তারা রোযা রাখা সত্ত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।***

এবছর ফিৎরানা ধার্য হয়েছে ৫০/ (পঞ্চাশ) টাকা। যারা অস্বচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিৎরানা প্রদান করবেন।

এম.টি.এ-তে হুযূর আনওয়ার (আই:)-এর খুতবা জুমুআ এবং কুরআনের দরস শোনার ব্যবস্থা করুন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো জামাতের সর্বস্তরের সদস্য/সদস্যাদের অবগত ও স্মরণ করানো উদ্দেশ্যে হালকা পর্যায়ে সাধারণ সভার আয়োজন করুন এবং **রোযার শেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে রিপোর্ট করুন।**

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
সেক্রেটারী তরবিয়ত এবং তা.জাদীদ

ওসীয়্যত সংক্রান্ত এলান

জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ অবগত আছেন যে, লন্ডন জলসা ২০০৪ এ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আইঃ) জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের উদ্দেশ্যে তাহরীক করেন যে ২০০৪-০৫ সনের মধ্যে মুসীর সংখ্যা ১৫ হাজারে উন্নীত করতে হবে এবং ২০০৮ সনের মধ্যে লাজেমী চাঁদাদাতাদের শতকরা ৫০ ভাগ আহমদীকে নেযামে ওসিয়্যতে শামিল করাতে হবে। এ বছর (২০০৪-০৫ সনে) আল্লাহ্‌র ফযলে সারা বিশ্বে মুসীর সংখ্যা ১৬ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র মোবারক তাহ্‌রীক পূর্ণ হয়েছে,আলহামদুলিল্লাহ্। খবর পাওয়া গেছে যে অনেক দেশের জামাত তাদের দেশে আগামী ২০০৮ সনের মধ্যে লাজেমী চাঁদাদাতার শতকরা ৫০ ভাগ আহমদীকে নেযামে ওসীয়্যতে শামিল করা সংক্রান্ত হুযূর (আই:) এর তাহরীক শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করার আকাঙ্খা ব্যক্ত করে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তাঁদের এ নেক ইচ্ছা পুরা করুন, আমীন।

এ প্রসঙ্গে বন্ধুদের জ্ঞাতার্থে বলা আবশ্যক যে, হুযূর (আইঃ)-এর তাহরীক মোতাবেক আমাদের জন্য মরকয থেকে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ০৫ এর মধ্যে মুসীর যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে, বছরের আট মাস অতিবাহিত হলেও আমরা এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছি, যা দুঃখজনক। উপরন্তু ২০০৮ সাল নাগাদ লাজেমী চাঁদাদাতার শতকরা ৫০ ভাগ আহমদীকে এ নেযামে শামিল করার গুরু দায়িত্বও আমাদেরকে পালন করতে হবে যে জন্য সকলকে সতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজে এগিয়ে আশা জরুরী। অন্যথায় খাকসারের একার পক্ষে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। দেশের সকল জামাতের মুখলেছ আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণের খেদমতে সবিনয় আরজ করছি, এখনো আমাদের হাতে যে সময় (সাড়ে তিন মাস) আছে, এর মধ্যে আপনারা হুযূর (আইঃ)-এর এ মোবারক তাহরীকে – "লাব্বায়েক" বলে শামিল হোন এবং তাঁর (আইঃ) তাহরীক ফলপ্রসূ করুন। সকল স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট, অন্যান্য ওহ্‌দাদারগণকে এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, খোদ্দাম ও আনসার সংগঠন সমূহের ওহ্‌দাদারগণকে এ তাহ্‌রীকে অংশ নিয়ে এ কাজে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করার জন্য সবিনয় আরজ করছি।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সেক্রেটারী-ওসায়া ও
সদর, মজলিসে মুসীয়ান, বাংলাদেশ

সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদের দফতর থেকে–

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণকারী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বরকত ও দোয়া কবুল হওয়ার মাস রমযান আরম্ভ হচ্ছে, এই জামাতের বহু পুরান এতিহ্য যে, এই রমযান মাসে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সম্পূর্ণ আদায়কারীদের নামের তালিকা হুযূর (আই:) এর নিকট রমযানের শেষের দিকে বিশেষ দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে। হুযূর (আই:) ২৭ শে রমযান এই দোয়া করে থাকেন; এবারও যথারীতি এই তালিকা আমরা পাঠাব ইন্‌শাআল্লাহ।

তাই প্রত্যেক জামাতের আমীর/ প্রেসিডেন্ট এবং উক্ত দফতরের কর্মকর্তাগণের নিকট বিনীত আরজ আপনারা নিজ নিজ জামাতে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা ওয়াদা মোতাবেক সম্পূর্ণ আদায়কারীদের নামের তালিকা আগামী ২৫ শে রমযানের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দফতরে রা খাকসারের বরাবরে অবশ্যই প্রেরণ করবেন যেন তা যথাসময়ে হুযূর (আই:) এর খেদমতে দোয়ার জন্য উপস্থাপন করা যায়।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বছর ৩১ শে ডিসেম্বর শেষ হবে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় হয়ে যায় সেই জন্য সকল ওয়াদাকারীগণ ও জামাতের স্থানীয় কর্মকর্তাগণকে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) বলেছিলেন নও মুবায়েনদের নিকট হতেও যেন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা নেয়া হয় এবং যে যা দিতে পারেন তা দিয়েই এ আন্দোলনে অংশ নিবেন অর্থাৎ জামাতের সকলেই যেন ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণ করে।

মোমেনের কদম কখনো পিছনে যায় না বরং আগে বাড়ে। তাই ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদার পরিমাণ যেন পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে কিছুটাও হলেও বেশী হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করছি। বৎসর শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকলের নিকট হতে নতুন বৎসরের ওয়াদার তালিকা সংগ্রহ করে বাংলাদেশের কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবেন যাতে এটা যথাসময়ে হুযূর (আই:) এর খেদমতে পেশ করা যায়।

আল্লাহতাআলা আমাদের সকলকে এই পবিত্র মাসে হুযূর (আই:) এর দোয়ায় শামেল হওয়ার তৌফিক দান করুন।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ

স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর বিশিষ্ট ধর্ম গবেষক, বক্তা ও লেখক মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের স্মরণে গত ১ অক্টোবর ২০০৫ বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাব ঢাকার ভিআইপি লাউঞ্জে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন মজীদ থেকে তেলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক। মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন জনাব মামুনুল হক। এরপর মরহুমের লিখা 'অ কবির কবিতা' পুস্তক থেকে তিনটি কবিতা 'সুবার জন্য ভালবাসা' 'যুদ্ধ নয় শান্তি' ও 'শেষ কথা' আবৃত্তি করেন তার পৌত্র আহমদ তৌসিফ চৌধুরী।

আলোচনা পর্বে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরের অধ্যাপক আমীর হোসেন, দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক জনাব হাবিবুর রহমান মিলন, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রতি ও সংলাপ সংগঠন 'বিকপ্যাজ'-এর নির্বাহী প্রধান ব্রাদার ডি শোজা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যতীন সরকার মরহুম চৌধুরী সাহেবের জীবন ও ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তাগণ মরহুমের জ্ঞান সাধনা, ধর্ম নিষ্ঠা, উদার ও অসাম্প্রদায়িক জীবনদর্শন এবং মানবতা বোধের বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বক্তাগণ মরহুমের অমূল্য রচনাবলী সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের আহ্বান জানান।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথি স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, সভাস্থল ছিল প্রায় পরিপূর্ণ যার প্রায় অর্ধেক ছিলেন অ-আহমদী। স্মরণ সভার শেষ পর্যায়ে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মরহুমের একমাত্র পুত্র জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী, সভাস্থলে মরহুমের রচিত পুস্তকাবলী এবং ব্যক্তিগত পাঠাগারের কিছু বই-এর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল হিব্রু ভাষায় বাইবেল।

শুভ বিবাহ

❖ গত ০৮/১০/০৪ ইং জামালপুর নিবাসী জনাব আরজু মিয়ার কন্যা মোসাম্মাৎ তহুরা আক্তার এর বিয়ে, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নবাসী জনাব আব্দুল আহাদ সরকারের পুত্র জনাব আফরোজ সরকার-এর সাথে ৫০,১০১/- (পঞ্চাশ হাজার একশত এক) টাকা দেনমোহরানায় অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

রেজি নং ঃ ০৪৭৪/০৪

❖ গত ১০/১২/০৪ইং যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর, সাতক্ষীরা নিবাসী মোহাম্মদ শহীদ গাজী-এর কন্যা মোসাম্মৎ ছাইদা পারভীন এর বিয়ে যতীন্দ্রনগর সাতক্ষীরা নিবাসী জনাব মোহাম্মদ ছন্নত আলী গাজী এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান এর সাথে ১৭,৯৯৯/- (সতের হাজার নয় শত নিরান্নব্বই) টাকা দেনমোহরানায় অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

রেজি নং ঃ ০৪৭৫/০৪

❖ গত ২৬/১১/০৪ইং যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর, সাতক্ষীরা নিবাসী এস, এম, আব্দুল মাজেদ এর কন্যা মোসাম্মৎ মাহবুবা খাতুন (স্বপ্না) এর বিয়ে আগুলিয়া ঢাকা নিবাসী জনাব মোঃ পিয়ার আলী সরকারের পুত্র জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এর সাথে ১০,০০০/- (এক লক্ষ মাত্র) টাকা দেনমোহরানা ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

রেজি নং ঃ ০৪৭৬/০৪

❖ গত ০৩/১২/২০০৩ইং আহমদনগর নিবাসী জনাব মাষ্টার মমতাজ হোসেন এর কন্যা মোসাম্মাৎ মেরাজ মনি এর বিয়ে জনাব মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এর পুত্র জনাব কামালউদ্দিন আহমদ মোহাম্মদী হাউজিং লিঃ মোহাম্মদপুর ঢাকা এর সাথে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেনমোহরানা ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

রেজি নং ঃ ০৪৭৭/০৫

কৃতি ছাত্রী

আমার মেয়ে আফিকা পারভীন (শান্তা) এবার S.S.C. পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে G.P.A.5 অর্থাৎ A+ পেয়েছে। সে জামাতের সকলের কাছে ভবিষ্যতে জামাতের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় কর্মী হতে পারে ও উচ্চ থেকে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য দোয়া প্রার্থী। ওয়াস্‌সালাম।

আনিসুর রহমান
১৫২, আহমদনগর

শোক সংবাদ

আমার নানী মোছাঃ আমেনা বেগম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁ এর সদস্যা গত ৬/৯/০৫ ইং রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৮টার সময় মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্যারালাইসেস রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ২ মেয়ে ও ১০ জন ছেলের মা ছিলেন। এছাড়া ১৬ জন নাতি ১১ জন নাতনীসহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। মরহুমার রূহের মাগফিরাত ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের কল্যাণের জন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ।

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা ১

নীচতলা

রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১

গুলশান ২ ঢাকা ।

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা

(রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 6th & 7th Issue October 15, 2005. ❑ Tk. 10.00
Fortnightly **The AHMADI** রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১। প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২। প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩। সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪। **রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন** [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫। **রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব** [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬। **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম** [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭। **আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে**। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)
অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯। দুরূদ শরীফ (অর্থসহ সালাত বই থেকে) প্রত্যেহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৮-১৪ জুলাই ২০০৫ তারিখের সৌজন্যে)

হযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহরিকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com